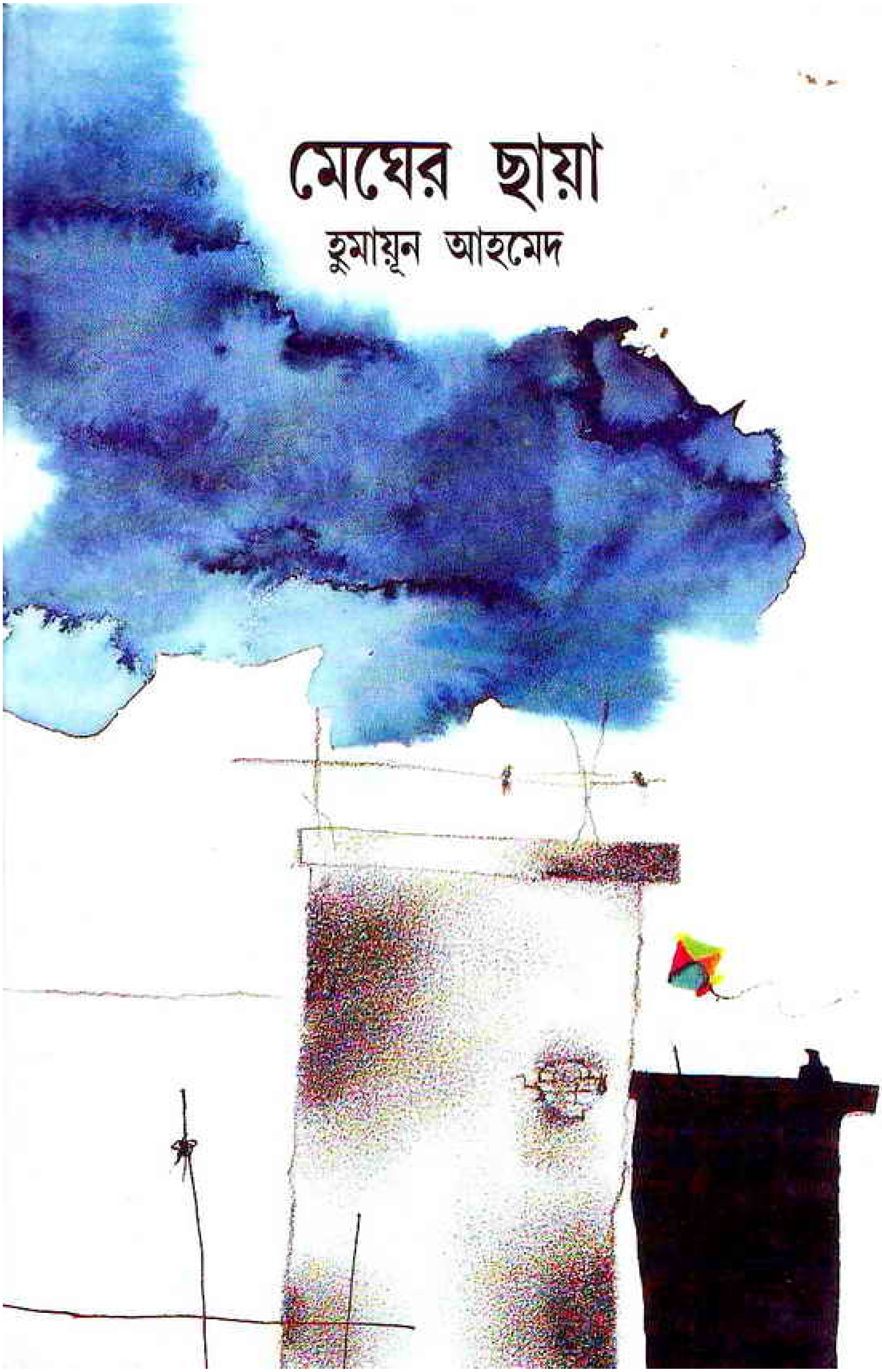
মেঘের ছায়া
হুমায়ূন আহমেদ

১

রেহানা গ্লাসভর্তি তেতুলের সরবত নিয়ে যাচ্ছিলেন, শুভ্র'র ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চাপা হাসির শব্দ আসছে। শুভ্র হাসছে। রাত একটা বাজে। শুভ্রের ঘরের বাতি নেভানো। সে অন্ধকারে হাসছে কেন? মানুষ কখনো অন্ধকারে হাসে না। কাঁদতে হয় অন্ধকারে, হাসতে হয় আলোয়। রেহানা ডাকলেন, শুভ্র!

শুভ্র হাসি থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, কি মা?

'কি করছিস?'

'ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙল। রাত কত মা?'

'একটা বাজে। তোর কি কিছু লাগবে?'

'না।'

শুভ্র আবার হাসছে। শব্দ করে হাসছে।

রেহানা চিন্তিত মুখে সরবতের গ্লাস নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। কেন জানি শুভ্রকে নিয়ে তাঁর চিন্তা লাগছে। তাঁর মনে হচ্ছে শুভ্র'র কোন সমস্যা হয়েছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব খালি গায়ে ফ্যানের নিচে বসে আছেন। কার্তিক মাস, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। শীত নেমে গেছে। ঘুমুতে হয় গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে। এই সময়ে খালি গায়ে ফ্যানের নিচে বসে থাকার অর্থ হয় না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বসে আছেন, কারণ তাঁর গরম লাগছে। অল্প-অল্প ঘাম হচ্ছে। বুকে চাপা ব্যথা অনুভব করছেন। তাঁর ধারণা, তিনি হার্ট এ্যাটাক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। অন্য যে-কেউ এই অবস্থায় ঘাবড়ে যেত। ইয়াজউদ্দিন সাহেব খুব স্বাভাবিক আছেন। স্ত্রী'র দিকে তাকিয়ে বললেন, গ্লাসে কি?

'তেতুলের সরবত। বিট লবণ, চিনি, তেতুল। খাও, ভাল লাগবে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব কোন তর্কের ভেতর গেলেন না। গ্লাস হাতে নিলেন। রেহানার নির্বুদ্ধিতায় মাঝে মাঝে তিনি পীড়িত বোধ করেন। আজও করছেন। তাঁর কি সমস্যা রেহানা জানে না। রেহানাকে বলা হয় নি। অথচ সে তেতুলের সরবত নিয়ে এসেছে, এবং রেহানার ধারণা হয়েছে এই সরবত খেলে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ভাল লাগবে। কে তাঁকে এই সব চিকিৎসা শিখিয়েছে? বছর দুই আগে তাঁর একবার

তীব্র পেটব্যথা শুরু হল। রেহানা এক গ্লাস বরফ-শীতল পানি নিয়ে এসে উপস্থিত, পানির গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, পানিটা খাও, ভাল লাগবে। তিনি খেয়েছেন। আজও তাই করলেন, হাত বাড়িয়ে তেতুলের সরবত নিয়ে দু'চুমুক খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। রেহানা বললেন, ভাল লাগছে না?

'হ্যাঁ, ভাল লাগছে।'

'চিনি কম হয়েছে, আরেকটু চিনি দেব?'

'চিনি ঠিকই আছে।'

'শরীরটা কি এখন ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ, ভাল লাগছে। ফ্যান একটু বাড়িয়ে দাও।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শরীর মোটেই ভাল লাগছে না। নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। বসে থেকে স্বস্তি পাচ্ছেন না। শুয়ে পড়লে হয়ত ভাল লাগত। তিনি ঘড়ি দেখলেন, একটা দশ বাজে। ঘরে আলো জ্বলছে। আলো চোখে লাগছে। মানুষের অসুস্থতার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে — আলো অসহ্য বোধ হওয়া। অসুস্থতা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যেতে চায়।

রেহানা বললেন, তুমি কি বারান্দায় এসে বসবে? বারান্দায় হাওয়া আছে। হাওয়ায় বসলে তোমার ভাল লাগবে।

'চল বারান্দায় যাই।'

'সরবতটা খাবে না?'

'না।'

ইয়াজউদ্দিন স্ত্রীর সাহায্য ছাড়াই উঠে দাঁড়ালেন। বারান্দায় গিয়ে বসলেন। পুরানো ধরনের এই বাড়ির পেছনে লম্বা টানা ঝুল-বারান্দা। বারান্দার এক মাথায় তিনটি বেতের চেয়ার ছাড়া কোন আসবাব নেই। চেয়ার তিনটি দেয়াল ঘেসে পাশাপাশি সাজানো। সাদা রঙ করা, গদি সবুজ। মাঝখানের চেয়ারটা তাঁর। দীর্ঘ দশ বছরে তিনি কখনো মাঝের চেয়ার ছাড়া কোথাও বসেননি। আজ বসলেন। তিনি সর্ব দক্ষিণের চেয়ারে বসেছেন। মাঝেরটা খালি। তিনি ভেবেছিলেন, রেহানা এই ব্যাপারটা ধরতে পারবে। সে মনে হচ্ছে ধরতে পারেনি। রেহানা তাঁর পাশের চেয়ারেও বসেনি। মাঝখানে একটা খালি চেয়ার রেখে তৃতীয় চেয়ারটিতে বসেছে।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

'শুভ্র-র ঘরে বাতি জ্বলছে কেন? ও-কি জেগে আছে?'

'হ্যাঁ, জেগে আছে।'

'এত রাত পর্যন্ত তো জেগে থাকার কথা না। আমার মনে হয় সে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি একটু দেখে এসো তো।'

রেহানা উঠে চলে গেলেন। খালিগায়ে বারান্দায় বসে থাকায় তাঁর একটু শীত-শীত লাগছে। বুকের চাপ ব্যথা একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে। পানিতে গুলে একটা এ্যাসপিরিনের চার ভাগের এক ভাগ এবং ঘুমের জন্যে দু'টা পাঁচ মিলিগ্রামের ফ্রিজিয়াম খেয়ে শুয়ে পড়লে হয়। যে কোন শারীরিক অসুস্থতায় গাঢ় ঘুম সাহায্য করে। শরীর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তার বিকল অংশ ঘুমের মধ্যে ঠিক করে ফেলে, কিংবা ঠিক করে ফেলার চেষ্টা করে। তিনি রেহানার জন্য অপেক্ষা করছেন। রেহানা ফিরছেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব নিশ্চিত হলেন — শুভ্র জেগে আছে, সে মা'র সঙ্গে গল্প করছে। তারা দু'জন কি কথা বলছে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শোনার ইচ্ছা করল। সেই ইচ্ছা স্থায়ী হল না। তঁর বয়স চুয়ান্ন। এই পৃথিবীতে তিনি যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, তা বোধহয় বলা চলে। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি অন্যায় এবং অনুচিত ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেন নি। মা এবং ছেলের গল্প আড়াল থেকে শোনার ইচ্ছা অবশ্যই অন্যায় ইচ্ছা।

শুভ্র খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার কোলে শাদা রঙের বালিশ। শুভ্রের গায়ের ফুলহাতা শার্টটাও ধবধবে শাদা। শুভ্র কনুই-এ ভর দিয়ে মা'র দিকে ঝুঁকে আছে। তার মাথাভর্তি এলোমেলো চুল। চোখে চশমা নেই বলে শুভ্র'র বড় বড় কালো চোখ দেখা যাচ্ছে। রেহানা মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার এই ছেলেটা এত সুন্দর হল কেন? ছেলেদের এত সুন্দর হতে নেই। শারীরিক সৌন্দর্য ছেলেদের মানায় না।

শুভ্র বলল, তাকিয়ে আছ কেন মা?

রেহানা বললেন, মানুষ তো একে অন্যের দিকে তাকিয়েই থাকবে, বোকা। কখনো কি দেখেছিস দু'জন চোখ বন্ধ করে মুখোমুখি বসে আছে?

শুভ্র হাসল। রেহানা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। শুভ্র যখন হাসে, তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। মা-বাবার নজর খুব বেশি লাগে। তাঁর ধারণা, শুভ্রকে হাসতে দেখলেই তিনি এত মুগ্ধ হবেন যে নজর লেগে যাবে।

'শুয়ে পড়, শুভ্র।'

'ঘুম আসছে না মা। ঘুমের চেষ্টা করলে ঘুম আরো আসবে না। কাজেই আমি ঘন্টাখানিক জেগে থাকব। একটা কঠিন বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুতে যাব।'

'এত রাতে বই পড়বি? চোখের উপর চাপ পড়বে তো।'

'পড়ুক চাপ। যে ভাবে চোখ খারাপ হচ্ছে, আমার মনে হয়, এক সময় অন্ধ হয়ে যাব। অন্ধ হয়ে যাবার আগেই যা পড়ার পড়ে নিতে চাই মা।'

রেহানার বুক ধক্ করে উঠল। শুভ্রকে কঠিন ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। ধমক দিলে বা কঠিন কিছু বললে শুভ্র বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে থাকে। দেখতে খুব খারাপ লাগে।

'মা !'

'কি।'

'তুমি কি আমাকে হালকা করে এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে। '

'এত রাতে চা খেলে তো বাকি রাত আর ঘুমুতে পারবি না।'

'ঘুমুতে না পারলেই ভাল। বইটা শেষ করে ফেলতে পারব।'

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবি ?'

'হ্যাঁ। এক স্লাইস রুটি গরম করে দিও। রুটির ওপর খুব হালকা করে মাখন দিতে পার। চিনি দিও না। গোল মরিচের গুড়া ছড়িয়ে দিও।'

ইয়াজউদ্দিন বারান্দায় বসে আছেন। এ্যাসপিরিন খাননি। তবে দু'টা ফ্রিজিয়াম খেয়েছেন। নিজেই শোবার ঘরে ঢুকে ট্যাবলেট বের করেছেন। হাতের কাছে পানি ছিল না। তেতুলের সরবত দিয়ে ট্যাবলেট গিলতে হয়েছে। ঘুমের অষুধ খাবার আধঘণ্টা পর বিছানায় যেতে হয়। তিনি আধঘণ্টা পার করার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তার ঘুম এসে গেছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে। কয়েকবার হাই উঠেছে।

তিনি দেখলেন রেহানা ট্রেতে করে চা নিয়ে শুভ্রের ঘরে ঢুকছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ভ্রু কুঞ্চিত হল। দুপুর রাতে সে ছেলেকে চা বানিয়ে খাওয়াচ্ছে কেন? অন্ধ ভালবাসার ফল কখনো মঙ্গলময় হয় না। এই ব্যপারটা রেহানা কি জানে না? তিনি নানানভাবে নানান ভঙ্গিতে রেহানাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। রেহানা কিছুই বুঝেনি। তাঁর নিজের শরীর ভাল যাচ্ছে না। যে কোন সময় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন হাল ধরতে হবে শুভ্রকে। শুভ্রর সেই মানসিক প্রস্তুতি নেই। সে এখনো শিশু। রেহানা কি সেই শিশুকেই নানানভাবে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে না?

রেহানা এসে স্বামীর সামনে দাঁড়ালেন, কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বললেন, শুভ্র চা খেতে চাচ্ছিল, কি একটা বই না-কি পড়ে শেষ করবে।

ইয়াজউদ্দিন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, চল, ঘুমুতে যাই।

'তোমার শরীর কি এখন ভাল লাগছে?'

'হুঁ।'

'কাল সকালে একজন ডাক্তার দেখিও।'

'দেখাব।'

তাঁরা শোবার ঘরে ঢুকলেন। রেহানা বলল, ফ্যান থাকবে, না বন্ধ করে দেব? জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। ফ্যান বন্ধ করে দি?

'দাও।'

তাঁরা ঘমুতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন পায়ের উপর পাতলা চাদর টেনে দিলেন। তিনি নিজে এখন খানিকটা বিষণ্ন বোধ করছেন। তাঁর শরীর খারাপ করেছিল। বেশ ভালই খারাপ করেছিল। কে জানে হয়ত ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়েছে। তিনি নিজে সে ধাক্কা সামাল দেবার চেষ্টা করেছেন। রেহানাকে বুঝতে দেননি। তিনি কাউকে বিচলিত করতে চান না। তবু খানিকটা বিচলিত রেহানা হতে পারত। সে তার ছেলেকে বলতে পারত — তোর বাবার শরীরটা ভাল না। বারান্দায় বসে আছে। তুই যা, বাবার সঙ্গে কথা বলে আয়। রেহানা কিছুই বলেনি। বললে শুভ্র বারান্দায় এসে বসত। উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করত, বাবা, তোমার কি হয়েছে?

ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাঁর ভাল লাগতো। রেহানা তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের ধারণা, রেহানা তাঁকে ভালমত লক্ষ্য করে না। তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে ভাবেও না। যদি ভাবত তাহলে লক্ষ্য করতো — দ্বিতীয়বার বারান্দায় এসে তিনি মাঝখানের চেয়ারে বসেছেন। কেন বসেছেন? দু'পাশে দু'টি চেয়ার খালি রেখে তিনি কেন বসলেন? উত্তর কি খুব সহজ নয়? তিনি চাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র তার দু'পাশে বসুক।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

'শুভ্রর বয়স কত হল?'

'সাতাইশ বছর তিন মাস।'

ইয়াজউদ্দিন নিঃশব্দে হাসলেন। ছেলের বয়স বছর এবং মাস হিসেবে রেহানা জানে। সে কি তার স্বামীর বয়স জানে? তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় — আমার বয়স কত রেহানা? সে কি বলতে পারবে?

রেহানা বললেন, ওর এখন একটা বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?

'ও কি বিয়ের কথা কিছু বলছে?'

'না, বলছে না। ওকে বলতে হবে কেন? বিয়ের বয়স তো হয়েছে। সাতাশ বছর তো কম না . . . '

'অনেকের জন্যে খুবই কম। সাতাশ বছরেও অনেকে সাত বছর বয়েসী শিশুর মত থাকে।'

'শুভ্রকে নিশ্চয়ই তুমি শিশু ভাব না?'

ইয়াজউদ্দিন জবাব দিলেন না। বুকের চাপ ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। একইসঙ্গে চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। ফ্যান বন্ধ করে দেয়া ঠিক হয়নি। গরম লাগছে। ভ্যাপসা ধরনের গরম।

রেহানা উৎসুক গলায় বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছ?

'না।'

'তোমার কি জাভেদ সাহেবের কথা মনে আছে? পুলিশের এ আই জি ছিলেন – – বিয়ে করেছেন বরিশালে। মনে আছে?'

'আছে।'

'উনার এক ভাগ্নি আছে। ডাক নাম শাপলা — মেয়েটা খুব সুন্দর, টিভিতে গান গায়। বি গ্রেডের শিল্পী। নাটকও করে। ও লেভেল পাস করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। পালিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ে। থার্ড ইয়ার। গায়ের রঙ শুভ্রের মত না হলেও ফর্সা। তুমি কি মেয়েটাকে দেখবে?'

'আমি দেখব কেন?'

'তোমার পছন্দ হলে শুভ্রের জন্যে আমি মেয়ের মামা জাভেদ সাহেবের কাছে প্রস্তাব দিতাম।'

'বিয়ে করবে শুভ্র। আমার পছন্দের ব্যাপার আসছে কেন?'

'শুভ্রের কোন পছন্দ-অপছন্দ নেই, মতামত নেই। ওকে বিয়ের কথা বললেই হাসে . . . . ।'

ইয়াজউদ্দিন জড়ানো গলায় বললেন, এখন ঘুমাও। ভোরবেলা কথা বলব। ইয়াজউদ্দিন পাশ ফিরে শুলেন। কোনভাবে শুয়েই তিনি আরাম পাচ্ছেন না। বারান্দায় চটির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুভ্র হাঁটছে। বারান্দার এ মাথা থেকে ও মাথায় যাচ্ছে।

'রেহানা।'

'হুঁ।'

'শুভ্র কি বারান্দায় হাঁটাহাটি করছে?'

'কই, না তো!'

'মনে হচ্ছে চটির শব্দ শুনলাম।'

'ভুল শুনেছ। শুভ্র চটি পরে না।'

'ও আচ্ছা।'

ইয়াজউদ্দিন চিৎ হয়ে শুলেন। তাঁর মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উত্তেজিত। উত্তেজিত মস্তিষ্কে চটির শব্দ শুনছেন। তাঁর শরীর তাহলে ভালই খারাপ হয়েছে। এমন কি হতে পারে যে তিনি ঘুমের মধ্যে মারা যাবেন! ঘুমিয়ে মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রায় কখনো হয় না বললেই হয় — প্রকৃতি মানুষকে জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে নিয়ে আসে, নিয়েও যায় জাগ্রত অবস্থায়। তাঁর বেলায় নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম ঘটবে না। তবু ভয় লাগছে।

'রেহানা!'

'কি।'

'পানি খাব।'

রেহানা উঠলেন। পানির জন্যে একতলায় যেতে হল। দোতলায় ছোট একটা ফ্রীজ আছে। সেখানে পানির বোতল রাখা হয়নি। ইয়াজউদ্দিন বরফ-শীতল পানি ছাড়া খেতে পারেন না। রেহানা পানির বোতল এবং গ্লাস নিয়ে দোতলায় উঠে এসে দেখেন, ইয়াজউদ্দিন খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। শোবার সময় পাতলা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। পাঞ্জাবী খুলে ফেলেছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

তিনি এক চুমুকে পানির গ্লাস খালি করলেন। ঘড়ি দেখলেন, তিনটা বাজতে চলল, রাত শেষ হবার খুব বেশি দেরি নেই।

'শুভ্র কি জেগে আছে?'

'মনে হয়। ঘরে বাতি জ্বলছে।'

'ওকে একটু ডাক তো।'

'এখানে আসতে বলব?'

'না। বারান্দায় এসে বসতে বল।'

'তুমি ঘুমুবে না?'

'আজ আর ঘুমুব না। ঘুম আসছে না।'

'চা খাবে? চা করে দেব?'

'দাও।'

রেহানা চা আনতে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন বারান্দায় এসে বসলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুভ্রও এসে বাবার পাশে বসল। শুভ্রর হাতে একটা বই। অন্ধকারে বইয়ের নাম পড়া যাচ্ছে না। বেশ মোটা বই।

শুভ্র বলল, জেগে আছ কেন, বাবা? এই সময় তো তোমার জেগে থাকার কথা

না। সমস্যাটা কি?

'শরীর ভাল লাগছে না। ঘুমুতে চেষ্টা করছি, ঘুম আসছে না।'

'তোমাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তুমি কি কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না।'

'আজ পত্রিকায় দেখলাম, তোমার কটন মিলে গণ্ডগোল হয়েছে। মিলের ম্যানেজারের পায়ের রগ কেটে দিয়েছে। তুমি কি এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত?'

'আমি যখন ঘরে আসি তখন আমার বাইরের কর্মজগৎ ঘরে নিয়ে আসি না। মিলের ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তিত ঠিকই, কিন্তু আজকের শরীর খারাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তুমি জেগে আছ কেন বল।'

'আমি তো প্রায়ই রাত জাগি।'

'এমনভাবে কথাগুলি বললে যেন রাত জাগা খুব মজার ব্যাপার।'

শুভ্র হালকা গলায় বলল, আমার কাছে ভালই লাগে।

'রাত জেগে তুমি কি কর?'

'কিছুই করি না। মাঝে মধ্যে পড়াশোনা করি। তবে বেশির ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকি। ভাবি।'

'কি ভাব?'

শুভ্র জবাব দিল না। হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব আগ্রহ নিয়ে ছেলের হাসি দেখলেন। শুভ্র'র হাসি সুন্দর। দেখতে ভাল লাগে। সব শিশুর হাসি সুন্দর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাসির সৌন্দর্য নষ্ট হতে থাকে। শুভ্র'র হয়নি।

রেহানা চা নিয়ে এসেছে। চা আনতে তাঁর দেরি হবার কারণ বোঝা যাচ্ছে — শুধু চা আসে নি। আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে সকালের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। শুভ্র ওঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি একটু আগে চা খেয়েছি। আমি কিছু খাব না। তোমরা খাও।

ইয়াজউদ্দিন বললেন, তুমি বস শুভ্র। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

শুভ্র বসল। রেহানা বললেন, আমি কি বসব, না চলে যাব?

'বস, তুমিও বস।'

ইয়াজউদ্দিন চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, কি বই পড়ছ?

শুভ্র বলল — 'The End of Civilization'.

'ইন্টারেস্টিং বই?'

'না বাবা। কঠিন বই। নানান থিওরি। পড়তে ভাল লাগে না।'

'পড়তে ভাল লাগে না — তাহলে পড়ছ কেন?'

'যা আমার ভাল লাগে না তাও করে দেখতে ইচ্ছে করে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। আবহাওয়াটা চট করে অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে তিনি কোন একটা মিটিং-এ বসেছেন। কোম্পানীর জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন শুভ্রের সঙ্গে। রেহানা তাঁর পিএ, সে নোট নিচ্ছে। এক্ষুণি পিপ করে ইন্টারকম বেজে ওঠবে। রেহানা বলবে, স্যার, আপনার জরুরি কল। আপনি কথা বলবেন? লাইন দেব?

বাস্তবে তা হল না। রেহানা খুশি-খুশি গলায় বললেন, তুমি শুভ্রকে জিজ্ঞেস কর তো ও বিয়ে করতে চায় কি-না। শুভ্র হাসিমুখে মা'র দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মা'র ছেলেমানুষিতে মজা পাচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, তোমার মা তোমার বিয়ে নিয়ে খুব একসাইটেড বোধ করছে। তুমি কি বিয়ে করতে চাও?

শুভ্র বাবার চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে মা'র দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় বলল, হ্যাঁ চাই।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কোন ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় — সে বিয়ে করতে চায় কি-না তখন সে কিন্তু কখনো সরাসরি বলে না — চাই। তুমি এত সরাসরি বললে কেন শুভ্র?

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, আমি মা'কে খুশি করবার জন্যে বললাম। মা মনে-প্রাণে এইটিই আমার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছিল।

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ তোমার মা চান বলেই তুমি হ্যাঁ বললে? তোমার নিজের ইচ্ছা নেই?'

'আমার নিজের ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই।'

'তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কি বিয়ে করেছে?'

'এখনো করেনি তবে জাহেদ সম্ভবত করবে।'

'জাহেদ কে?'

'আমার বন্ধু। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আমি দেখেছি তাকে?'

'না। আমার বন্ধুরা কখনো আমার কাছে আসে না। আমি তাদের কাছে যাই।'

'ও কি করে?'

'এখনো কিছু করে না। প্রাইভেট টিওশনি করে।'

'তোমার কি মনে হয় না জাহেদ খুব দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ করছে?'

'ওর উপায় নেই, বাবা।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, উপায় নেই কেন? শেষে নিজেকে সামলে নিলেন। বাড়তি কৌতূহল দেখানোর প্রয়োজন তিনি বোধ করছেন না। কিন্তু তিনি প্রয়োজন বোধ না করলেও শুভ্র করছে। সে খুব আগ্রহ নিয়ে বলল, জাহেদ আসলে দারুণ সমস্যায় পড়েছে। ও যাকে বিয়ে করবে তার নাম কেয়া। বড় বোনের বাসায় থাকে। বড় বোন এবং দুলাভাই দু'জনই বেচারীকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে। দু'বার প্রায় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। একবার কেয়া রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরেছে। তারা দরজা খুলে না। দরজা বন্ধ। বেচারী রাত এগারোটা পর্যন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদল।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, কেয়ার সঙ্গেও কি তোমার পরিচয় আছে?

'হ্যাঁ, পরিচয় আছে। খুব ভাল মেয়ে। গম্ভীর হয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হাসির কথা বলে!'

'প্রাইভেট টিউশনি সম্বল করে একটা ছেলে বিয়ে করে ফেলতে চাচ্ছে — তোমার কাছে কি হাস্যকর মনে হচ্ছে না?'

'জহিরের কোন উপায় নেই, বাবা। ওকে প্রাইভেট টিউশনি করে খেতে হবে।'

'প্রাইভেট টিউশনি করে খেতে হবে কেন?'

'ও বি.এ. পরীক্ষায় থার্ড ডিভিশন পেয়েছে — ওর পরিচিত বড় আত্মীয়স্বজনও নেই। ওর ধারণা, ও কখনো কোন চাকুরি পাবে না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব গোপনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, তাঁর ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে? এরাই কি তার বন্ধুবান্ধব? রেহানা একটু ঝুঁকে এসে আগ্রহ নিয়ে বললেন, শুভ্র, তুই কি জাভেদ সাহেবের ভাগ্নির সঙ্গে কথা বলে দেখবি? মেয়েটার নাম শাপলা। টিভিতে নাটক করে। খুব সুন্দর।

শুভ্র হাসতে হাসতে বলল, তোমার মাথায় শুধু একটা জিনিসই ঘুরছে। শোন মা, তুমি যদি চাও নিশ্চয়ই আলাপ করে দেখব।

'ওকে সঙ্গে করে কোন একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে এলি। গল্প-টল্প করলি। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই ওকে তোর পছন্দ হবে। কথা বলবি?'

'কেন বলব না মা?'

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের রেহানার কথাবার্তা পছন্দ হচ্ছে না। তিনি কিছু সিরিয়াস কথাবার্তা বলতে চাচ্ছিলেন। রেহানার উপস্থিতিতে তা সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, ঘুম পাচ্ছে, চল ঘুমুতে যাওয়া যাক। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রেহানা উঠলেন না। ছেলের পাশে বসে রইলেন। আগ্রহ ও উত্তেজনায় তাঁর চোখ চক্ চক্ করছে।

২

শুভ্রদের বাড়ির নাম 'কান্তা ভিলা।'

গেটের কাছে পেতলের নামফলক। রোজ একবার ব্রাসো ঘসে এই নাম ঝকঝকে করা হয়। গুলশান এলাকার আধুনিক বাড়িঘরগুলির সঙ্গে এর মিল নেই — পুরানো ধরনের বাড়ি। জেলখানা-জেলখানা ভাব আছে। উঁচু দেয়াল। দেয়ালের উপরে কাঁটাতারের বেড়া। বাড়ির গেটটাও নিরেট লোহার। বাইরে থেকে গেটের ভেতর দিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। গেটের কাছে কলিংবেল আছে। অনেকক্ষণ বেল বাজালে তবেই দারোয়ান দরজা খুলে বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করে, কে? কারণ এ বাড়িতে যারা আসে তারা গেটের কলিংবেল বাজায় না। গাড়ির হর্ন বাজায়। এ বাড়িতে যেসব গাড়ি আসে তার প্রতিটির হর্ন দারোয়ান চেনে। হর্ন শুনে বুঝতে পারে কে এসেছে। গাড়ির হর্ন শুনলে সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে। গেটের কলিংবেল বাজায় খবরের কাগজের হকার, ধোপা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, মাঝে মাঝে অসীম সাহসী কিছু ভিখিরী। এদের বেল শুনে ছুটে গিয়ে গেট খোলার কোন প্রয়োজন নেই। ধীরে সুস্থে গেলেই হয়।

অনেকক্ষণ ধরেই বেল বাজছে। দারোয়ান গোমেজ গেট খুলছে না। সে মোড়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। বেল বাজছে, বাজুক। ভিখিরী হলে বেল বজিয়ে ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে। ভিখিরী না হলে ক্লান্ত হবে না। বাজাতেই থাকবে। এক সময় গেট খুললেই হল। তাড়া কিছু নেই।

গোমেজ হাত থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে রাখল। বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে দরজা খুলল। গেটের বাইরে জাহেদ দাঁড়িয়ে আছে। গোমেজ জাহেদকে চেনে — শুভ্র'র বন্ধু। এর আগেও কয়েকবার এসেছে, তবে কখনো গেটের ভেতরে ঢুকেনি।

জাহেদ বলল, শুভ্র আছে?

গোমেজ হাই তুলতে তুলতে বলল, না।

এটা পরিষ্কার মিথ্যা কথা। শুভ্র ঘরেই আছে। গোমেজ কেন 'না' বলল সে নিজেও জানে না। তাকে কেউ মিথ্য বলতে বলেনি। জাহেদ বলল, ওর সঙ্গে খুব দরকার ছিল। ও কোথায় গেছে জানেন?

'না।'

'কখন বাসায় ফিরবে সেটা বলতে পারবেন?'

'উঁহু।'

জাহিরের মন খারাপ হয়ে গেল। আজ বাসের স্ট্রাইক। সে কলাবাগান থেকে গুলশান পর্যন্ত এসেছে অনেক যন্ত্রণা করে। কিছু হেঁটে, কিছু শেয়ারের রিকশায়, কিছুটা টেম্পোতে। সুযোগ বুঝে টেম্পোর ভাড়া করে দিয়েছে দু'গুণ। তার পকেটে এখন সাতটা টাকা আছে। এই সাত টাকায় কলাবাগান ফিরে যাওয়াই সমস্যা। তা ছাড়া প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে। এক কাপ চা এবং একটা বিসকিট না খেলেই নয়। পেটের আলসার খুব খারাপ পর্যায়ে আছে। ডাক্তার খালি পেটে চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। চা-বিসকিট খেতে গেলে তিনটাকা চলে যাবে। থাকবে মাত্র চার।

জাহেদ দারোয়ানকে বলল, ঘণ্টা দু'-এক পর এসে খোঁজ নেই, কি বলেন?

'নিতে পারেন।'

দারোয়ান গেট বন্ধ করে ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে দিল। এ বাড়ির গেট সব সময় ভেতর থেকে তালাবন্ধ থাকে।

জাহেদ এক কাপ চা, দু'টা টোস্ট বিসকিট খেল। লোভে পাড়ে একটা কলাও খেয়ে ফেলল। আজ সকালে নাশতা খেতে পারেনি। দারুণ খিদে লেগেছে। অপরিচিত চায়ের দোকানে বসে সময় কাটানোও সমস্যা। কিছুক্ষণ বসে থাকলেই দোকানের মলিক সন্দেহজনক চোখে তাকাতে শুরু করে। সময় খারাপ, সব কিছুই দেখতে হয় সন্দেহের চোখে। তারচেয়েও বড় সমস্যা জাহেদের কাছে ঘড়ি নেই — দু'ঘণ্টার কতক্ষণ কাটল বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর পর একে ওকে 'ক'টা বাজে' জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। একটা সময় ছিল ক'টা বাজে জিজ্ঞেস করলে লোকজন খুশি হত। আগ্রহ করে সময় বলত। এখন রেগে যায়। এমনভাবে তাকায় যেন সময় জানতে চাওয়ার পেছনেও কোন মতলব আছে।

জাহেদ দেড় ঘণ্টার মাথায় আবার বেল টিপল। দারোয়ান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আসেন নাই। কিছু বলার থাকলে আমারে বলেন — খবর দিয়া দিব।

জাহেদ বলল, ভায়া মিডিয়া বললে হবে না। সরাসরি বলতে হবে। বরং একটা চিঠি লিখে যাই।

'লেখেন।'

'কাগজ-কলম দিতে পারবেন?'

'না।'

জাহেদকে আবার সেই চায়ের দোকানে ফিরে যেতে হল। দোকানের মালিকের কাছ থেকে কাগজ-কলম নিয়ে সে লিখল —

শুভ্র, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বুধবারে। তুই কি বরযাত্রী যাবার জন্য আমাকে একটা গাড়ি দিতে পারবি? —

দারোয়ানের কাছে চিঠি জমা দিয়ে সে কলাবাগান রওনা হল হাঁটতে হাঁটতে। হাঁটতে খারাপ লাগছে না, কিন্তু খিদেটা জানান দিচ্ছে। পেটে অল্প-অল্প ব্যথাও শুরু হয়েছে। ব্যাথাটাকে আমল দেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া তুচ্ছ শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তার সময় নেই। মাথার সামনে ভয়াবহ সমস্যা। প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল — কেয়াকে কোথায় এনে তুলবে? সে নিজে থাকে ছোটমামার বাসায়। ভেতরের বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমায়। বৃষ্টির সময় অবধারিতভাবে ক্যাম্পখাটের খানিকটা বৃষ্টির পানিতে ভিজে। বউকে নিয়ে ক্যাম্পখাটে ঘুমানো সম্ভব না। ছোটমামার বাড়িতে দু'টা কামরা। একটায় ছোট মামা-মামী থাকেন। অন্যটায় মামার তিন মেয়ে থাকে। বসার ঘর বলে কিছু নেই। থাকলে কোন সমস্যা ছিল না। কয়েকটা দিন সোফায় পার করে দেয়া যেত। কেয়া ঘুমাতো সোফায়, সে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে।

জাহেদ তার মামা মিজান সাহেবকে বিয়ের খবর দিয়েছে পরশু। রাতের ভাত খাবার পর। জাহেদ ভয়ে ভয়ে ছিল — খবর শুনে মামা না জানি কি করেন। তেমন কিছুই করেননি। তিনি দীর্ঘসময় জাহেদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছেন — 'ও'। তিনি হতভম্ভ হয়ে গেছেন, বলাই বাহুল্য। এই অবস্থায় জাহেদ বিয়ে করতে যাচ্ছে কেন? বউকে খাওয়াবে কি? বউ থাকবে কোথায়? — কিছুই জানতে চান নি। জাহেদের মামী মনোয়ারা বললেন, সত্যি বিয়ে, না ঠাট্টা করছ?

জাহেদ বলল, সত্যি সত্যি বিয়ে করছি, মামী। মেয়ের নাম কেয়া। এ বাড়িতে দু'বার এসেছে। আপনি হয়ত দেখেছেন। কেয়ার নানি মৃত্যুশয্যায়। তিনি নাতনীর বিয়ে দেখে যেতে চাচ্ছেন আর কেয়ার আপা-দুলাভাইও কেয়াকে আর পুষতে পারবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

'ওরা কি দেখে তোমার কাছে বিয়ে দিচ্ছে — তোমার আছে কি?

জাহেদ কিছু বলল না। মনোয়ারা বললেন — বউ নিয়ে কোথায় উঠবে?

জাহেদ বলল, এখনো কিছু ঠিক করিনি।

'তোমার কি কোথাও ওঠার জায়গা আছে?'

'জ্বি না।'

'বিয়ের খরচপাতির টাকা-পয়সা আছে?'

জাহেদ মাথা চুলকে বলল, জ্বি না।

মিজান সাহেব ঠিক আগের ভঙ্গিতে বললেন, ও!

জাহেদের এই মুহূর্তে কিছুই নেই। পোস্টাফিসে পাসবই খুলেছিল। টিউশনির টাকার কিছু কিছু সেখানে রাখত। পাসবইয়ে সাতশ' তেত্রিশ টাকা আছে। মা'র গলার একটা হার আছে দেড় ভরীর। ওটা বিক্রি করলে বিয়ের খুচরা খরচ সামলে ফেলা যায়। বিয়ের খরচ বলতে বিয়ের শাড়ি, হলুদের শাড়ি। কিছু সেন্ট-ফেন্ট। কিন্তু মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন হারটা যেন জাহেদের বিয়ের সময় তার বৌকে দেয়া হয়। এইসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে ভাবলে এখন চলে না। সেন্টিমেন্টের দিন শেষ। আজকের দিন হল রিয়েলিটির দিন। হার বর্তমানে তার বড় বোন নীলিমার কাছে আছে। সেই হার পাওয়া যাবে কি–না তা নিয়ে জাহেদের ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দিন সাতেক আগে আনতে গিয়েছিল। নীলিমা বলল, হার পালিশ করতে দেয়া হয়েছে। গতকাল জাহেদ আবার গেল। নীলিমা বলল, রশিদটা পাওয়া যাচ্ছে না। বলেই এক ধরনের ঝগড়া শুরু করল। ঝগড়ার বিষয় হল — তার বিয়ের সময় মা কিছুই দেন নি। হাতের দু'টা বালা দিয়েছে। তার মধ্যে সোনা নামমাত্র। জাহেদ বলল, এসব আমাকে বলে লাভ কি? আমি এর কি করব?

নীলিমা বলল, হাতের বালা জোড়া মা'র ব্যবহারী জিনিস হলেও একটা কথা ছিল। আমি কিছুই বলতাম না। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দিতাম। দোকানের জিনিস। কোন এক কায়দা করে নীলিমা গলার হারটা রেখে দিলে জাহেদ বিরাট বিপদে পড়বে। এতটা নিচে আপা নামবে জাহেদ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অবিশ্বাস্য জিনিস সংসারে ঘটছে। তাছাড়া অভাবী সংসারে ক্ষুদ্রতা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

জাহেদ বিয়ে করছে। কেউ কোন রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। নীলিমা একবারও জিজ্ঞেস করেনি, বৌ নিয়ে কোথায় উঠবি? সম্ভবত ভয়েই জিজ্ঞেস করেনি, যদি জাহেদ বলে বসে কয়েকটা দিন তোমার এখানে থাকব। সে হয়ত ভেবেছে, একবার বৌ নিয়ে উঠলে আর তাকে তাড়ানো যাবে না। এরকম ভাবা অবশ্যি অন্যায়ও না। ভাবাটাই স্বাভাবিক।

জাহেদের ভরসা এখন তার বন্ধু–বান্ধবরা। সে মুখচোরা স্বভাবের। কাউকে এখনো কিছু বলে নি। বলতে লজ্জা করছে। শুভ্রকে গাড়ির কথা বলেছে। গাড়ি পাওয়া যাবে। শুভ্র'র কাছে কেউ কিছু চেয়ে পায়নি, তা কখনো হয় নি। গাড়ির ব্যবস্থা হবে। তবে শুভ্র'র কানে খবরটা পৌঁছলে হয়। টেলিফোনে শুভ্রকে কখনো পাওয়া যায় না। সে টেলিফোন ধরে না। যে ধরে সে অবধারিতভাবে বলে, শুভ্র বাসায় নেই, কিংবা সে এখন ঘুমুচ্ছে। জাহেদ ঠিক করল, আজ রাত ন'টা–দশটার দিকে একবার টেলিফোনে চেষ্টা করবে। পাওয়া যাবে না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা। পাওয়া যেতেও তো পারে। নীলিমাদের বাসার কাছেই বড় একটা মিষ্টির

দোকান। দোকান নতুন চালু হয়েছে বলেই সেখান থেকে টেলিফোন করতে দেয়। তবে দোকানে ঢুকে এমন ভাব করতে হয় যে প্রচুর মিষ্টি কেনা হবে। কেনার আগে একটু বাড়িতে টেলিফোন করে জেনে নেয়া।

জাহেদের দুলাভাই মোবাশ্বের আলি, জাহেদকে দেখেই মুখ অন্ধকার করে ফেললেন। সব সময়ই করেন। আজ একটু বেশি করলেন। শুকনো গলায় বললেন, তোমার আপা তো নেই। নারায়নগঞ্জ গেছে। আজ আসবে না।

জাহেদ বলল, আপা গয়নাটা এনে রেখেছে কি-না জানেন দুলাভাই?

'কোন গয়না?'

'ঐ যে মা'র গলার একটা হার। পালিশ করতে দিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা — হ্যাঁ — একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, বুঝলে? বিরাট ঝামেলা।'

জাহেদ হতভম্ব গলায় বলল, কি ঝামেলা?

'দোকানই উঠে গেছে। হিন্দু দোকান ছিল, মনে হয় কাউকে কিছু না জানিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে। ইন্ডিয়া যাওয়ার একটা ধুম পড়েছে। তবু খোঁজ খবরের চেষ্টা করা হচ্ছে — কিছু হবে বলে মনে হয় না। ঐটার আশা তুমি ছেড়ে দাও।'

জাহেদ করুণ গলায় বলল, কি বলছেন দুলাভাই!

'যা সত্য তাই বললাম। তবে তোমার বৌকে গয়না আমরা একটা দিব। এখন পারব না। ধীরে সুস্থে দিব। তোমার আপা পরশুদিন আসবে। তখন এসে খোঁজ নিও। সে বিস্তারিত বলবে।'

'বিস্তারিত কি বলবে?'

'কোন দোকানে জমা দিয়েছিল, কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই সব আরকি। জানা না জানা অবশ্যি সমান।'

জাহেদ উঠে দাঁড়াল। মোবাশ্বের আলি বললেন, চলে যাচ্ছ?

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও। চা খেতে চাইলে খেতে পার। কাজের মেয়েটাকে বললে চা বানিয়ে দেবে।'

'না, চা খাব না।'

জাহেদ ঘর থেকে বের হয়ে এল। ভেবে পেল না, একবার কেয়ার কাছে যাবে কি-না। এত সকাল সকাল শুভ্রকে টেলিফোন করা ঠিক হবে না। রাত ন'টার পর করতে হবে। ন'টা পর্যন্ত কি করবে? বরং কেয়ার সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।

কেয়াদের বাসায় যেতে লজ্জা করে। অস্বস্তিও লাগে। কেয়ার বড় বোন তাকে

সহ্যই করতে পারে না। অবশ্যি এই মহিলা হয়ত কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। আজ পর্যন্ত জাহেদ তাঁকে মিষ্টি করে কথা বলতে শুনেনি। জাহেদের ইচ্ছা সময় এবং সুযোগ হলে সে ভদ্রমহিলাকে বলবে — বকুল আপা, ফুলের নামে আপনার নাম কিন্তু সবার সঙ্গে এমন কঠিন আচরণ করেন কেন? সেই সুযোগ হয়ত কখনোই হবে না।

জাহেদ কেয়াদের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল রাত ন'টায়। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠতে হয়। পাঁচতলা পর্যন্ত ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকারে সিঁড়ি ভাঙ্গা খুবই ক্লান্তিকর ব্যাপার। সব সময় মনে হয় এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হল, কিন্তু শেষ হয় না। এক সময় মনে হয় সিঁড়ির ধাপগুলির উচ্চতার হের-ফের ঘটছে। এক ধরনের টেনশান, সিঁড়িতে ঠিকমত পা পড়ছে তো?

বেল টিপতেই জলিল সাহেব দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, আরে আসুন, আসুন। মনে মনে আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কেয়া ঘরেই আছে। বাচ্চাদের পড়াচ্ছে। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

জলিল সাহেবর পরনে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি। তিনি সেইভাবেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। তিনি এ পরিবারের কেউ না। এদের একটি কামরা সাবলেট নিয়েছেন। মাসে সাতশ' করে টাকা দেন। সাতশ' টাকা কেয়া দেয়। সংসারে খুব কাজে লাগে। জলিল সাহেবকে পরিবারের একজন বলেই মনে হয়। ব্যাপারটা জাহেদের ভাল লাগে না। একজন বাইরের লোক কেন এমনভাবে ঘুর ঘুর করবে? কেন সে কেয়াকে বলবে — কেয়া, দেখ তো আমার লুঙ্গি শুকিয়েছে কি-না। না শুকালে উল্টে দাও।

কেয়ার মুখ শুকনো।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোন কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত। সে ঘরে ঢুকেই বলল, কিছু বলবে?

জাহেদ বলল, না। তোমার কি শরীর খারাপ?

কেয়া বলল, শরীর ঠিকই আছে। এসো আমার সঙ্গে — ছাদে যাই। ছাদে গিয়ে কথা বলি।

কেয়া দরজার দিকে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে যাচ্ছে জাহেদ। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেয়ার মন এত খারাপ কেন?

উঁচু দালানের ছাদ ভাল লাগে না। সব সময় এক ধরনের অস্বস্তি লেগে থাকে। মনে হয় পৃথিবী থেকে অনেক দূরে ছাদে উঠবার মুখে সিঁড়িটা ভাঙা। কেয়া বলল, আমার হাত ধর। সিঁড়ি ভাঙা।

জাহেদ হাত ধরল। কত সহজ, কত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে এই মেয়েটির হাত ধরতে পারছে! এই আনন্দের কি কোন তুলনা হয়!

কেয়া রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। জাহেদ বলল — এমন ঘেঁসে দাঁড়িও না। রেলিং ভেঙে পড়ে যেতে পারে। আজকাল দালান-কোঠা বানাতে সিমেন্ট দেয় না। বালি দিয়ে কাজ সারে। তুমি এত চুপচাপ কেন কেয়া? কিছু হয়েছে?

'না, কি হবে! বিয়ের জোগাড়-যন্ত্র কি সব হয়েছে?'

'কিছুটা। বরযাত্রীর জন্যে মাইক্রোবাস ব্যবস্থা করেছি।'

'কি এক বিয়ে, তার আবার বরযাত্রী।'

জাহেদ বলল, যত তুচ্ছ বিয়েই হোক, বিয়ে তো।

কেয়া বলল, টাকা-পয়সা আছে তোমার কাছে?

'আছে কিছু।'

'সেই কিছুটা কত?'

জাহেদ চুপ করে রইল। কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, বিয়ের শাড়ি তো তোমাকে একটা কিনতে হবে। মোটামুটি ভাল একটা শাড়ি কেনা দরকার। আমার মেয়েরা বড় হয়ে মায়ের বিয়ের শাড়ি নিশ্চয়ই দেখতে চাইবে।

'ভাল শাড়িই কিনব।'

কেয়া বলল, আমার নানি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন। সামান্যই। চার হাজার টাকা। টাকাটা তুমি নিয়ে যাও।

'টাকা লাগবে না।'

'লাগবে। তোমার কি অবস্থা সেটা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। ভাল কথা — বিয়ের পর আমি উঠব কোথায়?'

'এখনো ঠিক করিনি।'

'একটা কিছু ঠিক কর। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে — আমি সেখানেই যাব — শুধু বিয়ের পরেও এখানে ফেলে রেখ না।'

'তা করব না।'

'তুমি তো তোমার ছোট মামার সঙ্গেই থাক।'

'হুঁ।'

'বারান্দায় ক্যাম্পখাট পেতে ঘুমাও?'

'হুঁ।'

'বৃষ্টি হলে ভিজে যাও?'

'হুঁ।'

'আমাকেও কি সেই ক্যাম্পখাটে থাকতে হবে?'

জাহেদ চুপ করে রইল। কেয়া বলল, ক্যাম্পখাটে থাকতে আমার কোন আপত্তি নেই। এই সব নিয়ে তুমি মন খারাপ করবে না। কষ্ট করে তোমার যেমন অভ্যাস আছে, আমারো আছে। শুধু যদি . . .

'শুধু যদি কি?'

কেয়া ক্ষীণ স্বরে বলল, শুধু যদি কয়েকটা দিন নিরিবিলি তোমার সঙ্গে থাকতে পারতাম। কেয়া ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি টাকাটা নিয়ে আসি। তোমাকে এত ক্লান্ত লাগছে কেন? খুব হাঁটাহাটি করছ?

'না।'

'টাকার জন্যে নানা ধরনের লোকজনের কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছ না তো?'

'না।'

'কারো কাছে টাকার জন্যে হাত পাতবে না। মনে থাকে যেন। তুমি দাঁড়াও।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর কেয়া চলে এল। তার হাতে ছোট্ট একটা ট্রে। পিরিচে ঢাকা এক কাপ চা। সঙ্গে দু'টা টোস্ট বিসকিট।

'ঘরে কিছু নেই। বিসকিট দিয়ে চা খাও।'

জাহেদ চা খাচ্ছে। কেয়া তাকিয়ে আছে। কেন জানি তার বড় মায়া লাগছে। তার ইচ্ছে করছে জাহেদকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে। বেশির ভাগ মেয়েরই কি এরকম হয়, না তার বেলাতেই হচ্ছে?

'এই খামে টাকা আছে। সাবধানে রাখ। আর শোন, তুমি একটা কাজ করবে — নিজের জন্যে একটা শার্ট এবং প্যান্ট কিনবে। নীল রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট আর ধবধবে শাদা রঙের প্যান্ট। মনে থাকবে?'

'নীল শার্ট, শাদা প্যান্ট কেন?'

'একবার একটা ছেলেকে নীল শার্ট আর শাদা প্যান্ট পরে যেতে দেখেছিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল। এখনো চোখে ভাসে।'

'ছেলেটাকে সুন্দর লাগছিল বলেই আমাকে সুন্দর লাগবে এমন তো কোন কথা নেই।'

'তর্ক করবে না। যা করতে বলছি করবে।'

'আচ্ছা, আমি উঠি এখন?'

'না, বোস আরো খনিকক্ষণ। কোন কথা বলার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাক।'

তারা দু'জনই চুপচাপ বসে রইল। কেয়ার বোনের ছোট মেয়েটি ছাদে এসে গম্ভীর গলায় বলল, ছোট খালা, মা তোমাকে ডাকে।

কেয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিচে চলে গেল। যাবার সময় জাহেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েও গেল না।

কেয়াদের বাড়ি থেকে বের হয়ে জাহেদ শুভ্রের বাসায় টেলিফোন করল। রেহানা টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, শুভ্র তো শুয়ে পড়েছে। কি বলতে হবে তুমি আমাকে বল, আমি বলে দেব।

জাহেদ হড়বড় করে বলল, কিছু বলতে হবে না। আমি আপনাদের বাড়ির দারোয়ানের কাছে একটা চিঠি দিয়ে এসেছি।

রেহানা বললেন, শুভ্র চিঠি পেয়েছে।

জাহেদ বাসায় ফিরল রাত এগারোটার দিকে। খেতে গেল রান্নাঘরে। মনোয়ারা ভাত বেড়ে দিলেন। এত রাতে ভাত গরম থাকে না। আজ গরম আছে। গরম গরম ভাত। ডিমভাজা, ডাল। গরম ভাতের রহস্য হল — ভাত রান্না হয়েছে। মনোয়ারার মা ঢাকায় এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। ভাতে টান পড়েছে। নতুন করে রাঁধতে হয়েছে।

মনোয়ারা বললেন, খাওয়ার পর চট করে শুয়ে পড়বে না। তোমার মামা তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। জাহেদ বলল, কি কথা মামী?

'কি কথা আমি কি করে বলব? আমাকে তো কিছু বলে নাই।'

'আপনি কিছুই জানেন না?'

'না, আমি কিছুই জানি না।'

মিজান সাহেব কথা খুব কম বলেন। বেশির ভাগ কথাবার্তাই তিনি হ্যাঁ হুঁ-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। সেই তুলনায় আজ অনেক কথা বললেন। তাঁর কথার সারমর্ম হচ্ছে — জাহেদ যেন বৌ নিয়ে এ বাসায় না উঠে। তাঁর সামর্থ্য ছিল না। তারপরেও তিনি দীর্ঘদিন জাহেদকে পুষেছেন। দু'জনকে পোষার তাঁর সামর্থ্য নেই। বিয়ে করার মত সাহস যখন জাহেদের আছে তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে প্রতিপালনের ক্ষমতাও তার আছে। জাহেদ যদি তাঁর কথা না শুনে বউ নিয়ে এখানে উঠে তাহলে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাবে।

জাহেদ চুপ করে শুনে গেল। কিছু বলল না। মিজান সাহেব কিছু শোনার জন্যেও অপেক্ষা করলেন না। এটা তাঁর স্বভাব না। তিনি নিজের কথা শেষ করে

একটা সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে সিগারেট শেষ করে ঘুমুতে গেলেন।

আজ সারাদিন জাহেদের খুব পরিশ্রম হয়েছে। বিছানায় শুয়ে পড়ামাত্র ঘুম এসে যাওয়ার কথা কিন্তু ঘুম এল না। সে সারা রাত জেগে কাটাল। শেষ রাতে তন্দ্রার মধ্যে কেয়াকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখল। জলিল সাহেব সেই দুঃস্বপ্নে কেয়াকে বৌ বৌ করে ডাকছেন।

৩

শুভ্র তার চশমা খুঁজে পাচ্ছে না। বিছানার পাশে রেখে সে বাথরুমে ঢুকেছিল চোখে পানি দিতে। বাথরুম থেকে বের হয়ে সে গেল বারান্দায়। বারান্দায় এ–মাথা থেকে ও–মাথা পর্যন্ত দু'বার হাঁটল। ঠিক সন্ধ্যায় চশমা ছাড়া পৃথিবীকে দেখতে তার ভাল লাগে। সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে। চারদিক অন্ধকার। এই অন্ধকারে বাতি জ্বলে উঠছে। চশমা ছাড়া এই বাতিগুলিকে অনেক উজ্জ্বল এবং ছড়ানো মনে হয়।

শুভ্র'র ইচ্ছা করছিল আরো খানিকক্ষণ হাঁটতে, কিন্তু সময় নেই। আজ জাহেদের বিয়ে। সন্ধ্যা মেলাবার পরপর বরযাত্রী রওনা হবে। শুভ্র বরযাত্রীদের একজন। সে মাইক্রোবাস নিয়ে যাবে। তার দেরি করার সময় নেই। শুভ্র ঘরে ঢুকল। চশমা খুঁজে পেল না। বিছানার পাশে এই সপ্তাহের টাইম পত্রিকা পাতা খোলা অবস্থায় আছে। পত্রিকার পাশে এক প্যাকেট ক্যাসো নাট। প্যাকেট খোলা হয়নি। বালিশের নিচে তার নোটবুক এবং পেনসিল। সবই আছে, চশমা নেই। শুভ্র তার শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করল। চশমা হারালে তার এ রকম হয়। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। নিজেকে এত অসহায় লাগে! মনে হয় অচেনা অজানা দেশের হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে সে হারিয়ে গেছে। চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কথা বলতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারে অসংখ্য মানুষ তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। সে যেমন ওদের দেখতে পাচ্ছে না, ওরাও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ওদের কাছে অদৃশ্য মানব।

শুভ্র আতংকিত গলায় ডাকল, মা! মা!

রেহানা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। শুভ্র ভাঙা গলায় বলল, আমার চশমা খুঁজে পাচ্ছি না, মা।

'তোর চিৎকার শুনেই বুঝেছি। শান্ত হয়ে বস তো এখানে। চশমা যাবে কোথায়? ঘরেই আছে। চশমা'র তো পাখা নেই যে উড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যাবে।'

'বালিশের কাছে রেখেছিলাম।'

'বালিশের কাছে রাখলে, বালিশের কাছেই আছে।'

রেহানা বিছানায় কোন চশমা দেখলেন না। খাটের নিচে পড়েছে বোধহয়। তিনি দ্রুত খাটের নিচটা দেখে নিলেন। শুভ্র বলল, মা, পাওয়া গেছে?

'পাওয়া যাবে। তুই চুপ করে বসে থাক তো। ঘামতে শুরু করেছিস।'

'সন্ধ্যা মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রী রওনা হবে।'

'চশমা এক্ষুণি পাওয়া যাবে। তুই যথাসময়ে যেতে পারবি। তাছাড়া বরযাত্রী কখনো সময়মত রওনা হতে পারে না। এক ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা দেরি হবেই।'

'মা, তুমি কথা বলে সময় নষ্ট করছ। আমার খুব অস্থির লাগছে।'

শুভ্র'র আসলেই খুব অস্থির লাগছে। অন্যসময় এতটা অস্থির লাগত না। কারণ তখন শুভ্র জানত জরুরি অবস্থার জন্যে দু'টা চশমা কাবার্ডে লুকানো আছে। আজ সেই চশমা দু'টি নেই। শুভ্র'র চোখ আরো খারাপ হওয়ায় — ঐ চশমা দু'টিতে নতুন গ্লাস লাগানোর জন্যে দোকানে পাঠানো হয়েছে। ভেরিলাক লেন্স লাগানো হবে। এক সপ্তাহ সময় লাগবে।

'মা, পাওয়া গেছে?'

'এখনো পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়া যাবে। চশমা খুলে রেখে তুই কোথায় কোথায় গিয়েছিস বল তো?'

'কোথাও যাই নি। বাথরুমে গিয়ে চোখে পানি দিয়েছি।'

'তাহলে চশমা বাথরুমেই আছে। তুই হাতে করে নিয়ে বেসিনের উপর রেখে চোখে পানি দিয়েছিস। তারপর চশমার কথা ভুলে গেছিস।'

রেহানা বাথরুমে ঢুকলেন। চশমা সেখানে নেই। তিনি বারান্দায় গেলেন। বারান্দায় ছোট একটা টেবিল আছে। শুভ্র মাঝে মাঝে ঐ টেবিলে চশমা রেখে ভুলে যায় — আজও নিশ্চয়ই তাই হয়েছে।

বারান্দার টেবিলে কিছু নেই। তিনি আবার শোবার ঘরে ঢুকলেন। চিন্তিত এবং ব্যথিত মুখে শুভ্র বসে আছে। তার ফর্সা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শুভ্র বলল, কি হবে মা!

'কিচ্ছু হবে না। পাওয়া যাবে। তুই আমার সঙ্গে বারান্দায় এসে বস তো দেখি। আর আমরা দু'জন চা খাই। আমি কাজের লোকদের বলছি। ওরা খুঁজে দেবে।'

'আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'তুই এত অল্পতে অস্থির হোস কেন বল তো?'

'চশমা ছাড়া আমি অন্ধ। অন্ধ হওয়াটা কি খুব অল্প?'

'ইস্ ঘেমে-টেমে একেবারে কি হয়েছিস! আয় আমার সঙ্গে।'

তিনি শুভ্রকে হাত ধরে বারান্দায় এনে বসালেন। দোতলা থেকে একতলায় নেমে বাবুর্চিকে বললেন খুব ভাল করে দু'কাপ চা বানাতে। কাজের মেয়ে শাহেদা এবং কাজের ছেলে তোতামিয়াকে দোতলায় এসে শুভ্র'কে চশমা খুঁজে দিতে বললেন। এ

রকম কখনো করা হয় না। এ বাড়ির কাজের লোকদের কখনো দেতলায় আসতে দেয়া হয় না। ওদের কর্মকাণ্ড একতলাতেই সীমাবদ্ধ। দোতলার যা কাজ রেহানাই করেন। তাঁর শুচিবায়ুর মত আছে।

শুভ্র বলল, ক'টা বাজে মা?

'খুব বেশি বাজে নি। মাত্র ছ'টা। তুই কাপড় পরে তৈরি হয়ে থাক। ড্রাইভারকে বলি মাইক্রোবাস বের করে রাখতে। তুই আমার সঙ্গে বসে চা খা। বোকা ছেলে! এত অল্পতে এমন নার্ভাস হলে চলে?'

'আমার দেরি হলে জাহিদ খুব অস্থির হয়ে পড়বে। আজ ওর বিয়ে। আজ কি ওকে অস্থির করা উচিত?'

'তোর দেরি দেখলে ও অস্থির হবে কেন?'

'ও তো কোন গাড়ি-টারি জোগাড় করতে পারে নি। আমাদের মাইক্রোবাসটা ওর ভরসা। এটাকেই ফুল-টুল দিয়ে সাজিয়ে বরের গাড়ি করা হবে।'

'তাহলে বরং এক কাজ করা যাক। মাইক্রোবাসটা পাঠিয়ে দেয়া যাক। তুই চশমা পাওয়ার পর আমার ছোট গাড়িটা নিয়ে যাবি।'

'এটা মন্দ না, মা।'

শুভ্র সাদা পাঞ্জাবী পরল। পাঞ্জাবীর হাতা কুঁচকে ছিল। রেহানা নিজে ইস্ত্রি করিয়ে দিলেন। হালকা খয়েরী রঙের প্যান্ট। সাদা পাঞ্জাবী, ধবধবে সাদা স্যান্ডেল। শুভ্রকে রাজপুত্রের মত লাগছে। রেহানা ছেলের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন। শাহেদা এবং মতি মিয়া দোতলা উলট-পালট করে ফেলছে। শুভ্রে'র অস্থির ভাব অনেকটা কেটে গেছে। সে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, ক'টা বাজে মা?

সাড়ে সাতটা বাজে, রেহানা ছেলেকে সেই খবর দিলেন না। বললেন, মাত্র সন্ধ্যা মিলিয়েছে। রাত বেশি হয়নি। তোর বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে কোথায়? কম্যুনিটি সেন্টারে?

'না। নাখালপাড়ায়। ওরা খুব গরীব। কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া করার মত পয়সা নেই।'

'মেয়ের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে?'

'না, মেয়ের বোনের বাসায়। মেয়ের বাবা-মা নেই। বড় বোন মানুষ করেছেন। উনার বাড়িতেই বিয়ে হচ্ছে।'

'তুই কি ঐ বাড়ি চিনিস?'

'না-মা।'

'চেনা থাকলে ভাল হত। সরাসরি ঐ বাড়িতে চলে যেতে পারতিস। বরযাত্রী

নিশ্চয়ই এর মধ্যে রওনা হয়ে গেছে . . .।'

'চশমা মনে হচ্ছে পাওয়া যাবে না, মা!'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। কোথায় কোন ফাঁকে পড়েছে। তোকে আরো সাবধান হতে হবে, শুভ্র।'

শুভ্র হাসল। কি সুন্দর করে ছেলেটা হাসে। যতবার দেখেন ততবার রেহানার বুক ধক্ করে উঠে। পুরুষ মানুষকে এত রূপবান হতে নেই। শুভ্র বলল, মা, আমি ছাদে গিয়ে বসব। তুমি আমাকে ছাদে দিয়ে এসো।

'আমি বরং চশমার দোকানে টেলিফোন করে দেখি।'

'লাগবে না মা। আমার এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না। তুমি আমাকে ছাদে দিয়ে এসো।'

রেহানা শুভ্রকে হাত ধরে ধরে ছাদে তুলে দিলেন। শুভ্র বলল, তুমি চলে যাও। আমি একা একা ছাদে হাঁটব।

'ভয় পাবি তো!'

'ভয় পাব কেন?'

রেহানা নিচে নেমে গেলেন। তাঁর নিজেরও মন খারাপ লাগছে। শুভ্র'র সামান্যতম কষ্টও তাঁর বুকে এসে লাগে। তিনি নিজের শোবার ঘরে ঢুকে তাঁর দূর সম্পর্কের বোন রিয়াকে টেলিফোন করলেন। রিয়া খুব আমুদে মেয়ে। ও এসে হৈচৈ করে শুভ্র'র মন ভাল করে দেবে। ও বাসায় আছে কিনা সেটাই কথা। রিয়ার বরও হয়েছে রিয়ার মত। দিন রাত চরকিপাক খাচ্ছে। রিয়ার বরের সঙ্গে বাইরে থাকার কথা।

রিয়াকে পাওয়া গেল। রেহানা বললেন, কি করছিস রিয়া?

রিয়া হাসতে হাসতে বলল, ছটফট করছি।

'ছটফট করছিস কেন?'

'আজ রাত বারোটায় আমাদের বাড়িতে ভূত নামানো হবে। এই টেনশানে ছটফট করছি।'

'ভূত নামানো হবে মানে কি?'

'সুইডেন থেকে জামানের এক বন্ধু এসেছে। ও না-কি ভূত আনার ব্যাপারে এক্সপার্ট। খুব ভাল মিডিয়াম। তা তুমি হঠাৎ টেলিফোন করেছ কেন?'

'এম্নি।'

'এম্নি তুমি কখনো টেলিফোন কর না। কারণটা দয়া করে বলে ফেল।'

'শুভ্র'র জন্যে খারাপ লাগছে।'

'কেন ! ওর কি হয়েছে ?'

'ওর মন খারাপ, বন্ধুর বিয়েতে যাবার কথা ছিল। যেতে পারেনি। চশমা হারিয়ে ফেলেছে।'

'চশমা হারানো তো ওর নতুন ঘটনা না। সব সময় হারাচ্ছে। গতবছর পিকনিকে গিয়ে চশমা হারিয়ে ফেলল। আমরা কত হৈচৈ করছি আর সে উবু হয়ে খুঁজেছে চশমা। বুবু, তুমি এক কাজ কর — দু'তিন হাজার চশমা কিনে রঙিন সুতা দিয়ে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখ।'

রেহানা হাসলেন। রিয়া বলল, হাসি না, আমি সত্যি সত্যি বলছি। শুভ্র এখন কি করছে — চশমার শোকে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে ?

'ছাদে হাঁটছে।'

'আমাকে টেলিফোন করার উদ্দেশ্য কি এই যে আমি এসে ওকে নিয়ে মন ভাল করে ফেরত দেব ?'

'না থাক, তোর প্রোগ্রাম আছে।'

'প্রোগ্রাম কিছু না। ভূতের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট। মানুষের এ্যাপয়েন্টমেন্ট যেমন বাতিল করা যায়, ভূতেরটাও যায়। আমি এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। আর শোন, তুমি কি শুভ্রের বিয়ে-টিয়ে দেবার কথা ভাবছ ?'

'মাত্র তো পাশ করল।'

'ওর বয়স এখন কত যাচ্ছে — চব্বিশ না ?'

'সাতাশ।'

'কি সর্বনাশ ! বিয়ের বয়স তো চলে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার চেনা একটি মেয়ে আছে। আমার মতই রূপবতী। বিহারী মেয়ে। বিহারী হলেও বোঝার উপায় নেই। বাঙালি কালচার ধরে ফেলেছে। রবীন্দ্র সংগীত গায়। জীবনানন্দের কবিতা পড়ে।'

'বাঙ্গালী মেয়ের কি দেশে অভাব ?'

'রূপবতী মেয়ের অভাব তো আছেই। তুমি আমার মত আরেকজন খুঁজে বের কর — আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। শুভ্রকে তো আর যার-তার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে না। তার পাশে রাজকন্যা লাগবে। যাই হোক, বুবু, তুমি শুভ্রকে তৈরি হতে বল। আমি আসছি। বিহারী মেয়েটির একটা ছবি আমার কাছে আছে। আসার সময় কি নিয়ে আসব ?'

'তুই নিজে আয়। ছবি-টবি কিছু আনতে হবে না।'

শুভ্র তাদের ছাদের ঠিক মাঝখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ আকাশের দিকে। তবে চোখ বন্ধ। চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার কি মানে রেহানা বুঝলেন না। তিনি ডাকলেন, এই শুভ্র !

শুভ্র মা'র দিকে তাকাল। রেহানা আনন্দিত গলায় বললেন, এই নে চশমা। পাওয়া গেছে। বারান্দায় যে ফুলের বড় টবটা আছে — ঐ টবের পেছনে পড়ে ছিল। শুভ্র মা'র হাত থেকে চশমা নিতে নিতে মৃদু স্বরে বলল, থ্যাংকস মা। রেহানা বললেন, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না — চশমা ঐ খানে কিভাবে গেল।

'পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।'

'মাঝখান থেকে তোর যাত্রা নষ্ট। আর ঘন্টা খানিক আগে পাওয়া গেলে কি ক্ষতি হত ! তোর মন নিশ্চয়ই খারাপ।'

'না মা। মন ঠিক করে ফেলেছি।'

'কিভাবে ঠিক করলি ?'

'আমার মন ঠিক করার কিছু নিজস্ব টেকনিক আছে।'

'আমাকে শিখিয়ে দে। আমারো তো প্রায়ই মন খারাপ থাকে।'

'আমার টেকনিক কাউকে শেখানো যাবে না। উদ্ভট সব টেকনিক। শুনলে তুমি ভাববে আমার মাথা খারাপ।'

'তোর মাথা খানিকটা খারাপ তো বটেই। শোন্ শুভ্র, তোর রিয়া খালা আসছে। তুই তার সঙ্গে ঘুরে আয়। তোর ভাল লাগবে।'

'ছাদে ঘুরতেই আমার ভাল লাগছে, মা।'

'তুই কাপড়-চোপড় পরে সুন্দর করে সেজে বসে আছিস — রিয়ার সঙ্গে ঘুরে আয়। তোর ভাল লাগবে।'

'আমি যাব না, মা। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

দু'জন ছাদ থেকে নেমে আসছে। রেহানা বললেন, আমার হাত ধর। হাত ধরে ধরে নাম।

'হাত ধরতে হবে না, মা। এখন চোখে চশমা আছে, সব দেখতে পাচ্ছি।'

'চশমা থাকলে বুঝি আর মা'র হাত ধরা যায় না !'

শুভ্র মা'র হাত ধরে থমকে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, মা, তুমি আমার চশমাটা লুকিয়ে রেখেছিলে, যাতে আমি আমার বন্ধুর বিয়েতে যেতে না পারি। তুমি চাও না আমি আমার দরিদ্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশি। ওরা কিন্তু মা, আমাকে খুব পছন্দ করে। আমিও ওদের পছন্দ করি। তোমাকে যতটা করি ততটা করি না, কিন্তু করি . . . .

রেহানা চট করে কিছু বলতে পারলেন না। চশমার ব্যাপারটা শুভ্র এত সহজে ধরে ফেলবে তা তিনি অনুমান করেন নি। শুভ্র বলল, তুমি কি আমার কথায় রাগ করলে মা?

রেহানা জবাব দিতে পারলেন না। গাড়ির হর্ন শোনা যাচ্ছে। রিয়া চলে এসেছে। সে গাড়ি থেকে নামছে না — ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে। শুভ্র বলল, ছোট খালা চলে এসেছে — চল মা, নিচে যাই।

গাড়ির পেছনের সীটে রিয়া গা এলিয়ে বসে আছে। এই অন্ধকারেও সিনেমার নায়িকায় মত কাল চশমায় তার মুখ ঢাকা। চুল বাঁধা নেই। বাতাসে এলোমেলো হয়ে আছে। রিয়া জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, শুভ্র, উঠে আয়।

শুভ্র বলল, আমি আজ কোথাও যাব না, ছোট খালা।

রিয়া ক্লান্ত গলায় বলল, মজুমদার সাহেব গাড়ি স্টার্ট দিন। মজুমদার সাহেব যাকে বলা হল, শুভ্র তাকে আগে কখনো দেখেনি। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। ভারিক্কি চেহারা। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের গোল চশমা। ভদ্রলোক বললেন, উঠে আসুন না। আপনার খারাপ লাগবে না।

রিয়া বলল, মজুমদার সাহেব, ওর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ও যখন বলেছে যাবে না, তখন যাবে না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

'রাগ করেছ খালা?'

'অফকোর্স রাগ করেছি। আমি তো তোর মত সুপারম্যান না যে আমার মধ্যে রাগ, ঘৃণা থাকবে না। তুই চশমা পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

'পাঞ্জাবীতে তোকে দারুণ লাগছে রে শুভ্র! তোদের বাড়িতে কেন আসি না জানিস? যতবার আসি ততবারই মনে হয় তুই আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছিস। অন্যের সৌন্দর্য আমি সহ্য করতে পারি না। মজুমদার সাহেব, শুভ্রকে সিনেমার নায়কের মত লাগছে না?'

'বাংলা ছবির নায়কের কথা বলছেন?'

'না না, শুভ্রকে লাগছে পিটার ও টুলের মত। ফিগারেও মিল আছে। শুভ্র, উঠে আয় না। অনেকদিন তোর সঙ্গে গল্প করি না।'

'আজ ইচ্ছা করছে না, ছোট খালা।'

'তোর জন্যে আমি মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি, তুই জানিস? দু'জন প্রাইমারী সিলেকশন পেয়েছে। তোর মা একজনকে দেখেছিল, আমি বাতিল করে দিয়েছি।'

'ভাল করেছ।'

'তুই আয় শুভ্র — তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'না, আজ না।'

মজুমদার সাহেব গাড়ি স্টার্ট দিলেন। শুভ্র গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ করে তার মনে হচ্ছে কিচ্ছু করার নেই। ইদানীং এই অনুভূতি তার ঘন ঘন হচ্ছে। ছোট খালার সঙ্গে চলে গেলেও হত। না যাওয়ার পেছনে তার প্রধান যুক্তি হল — ছোট খালা রাতে তাকে ফিরতে দিত না। তার থেকে যেতে হত। অন্যের বাড়িতে থাকতে তার ভাল লাগে না। তার নিজের ধারণা সে অন্ধ। কোন অন্ধ তার পরিচিত জায়গা ছাড়া স্বস্তি পায় না। সেও পায় না।

দারোয়ান গেট বন্ধ করে এগিয়ে আসছে। এই দারোয়ানের নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। দারোয়ান বলল, ভাইজান, বাগানে বসবেন? চেয়ার এনে দেব?'

'না।'

গোমেজ কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। কি দেখছে এত আগ্রহ নিয়ে? শুভ্র বলল, কিছু বলবে গোমেজ?

'জ্বি না। স্যার, আপনার চশমা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

শুভ্র মনে মনে হাসল। তার চশমা হারানো মনে হচ্ছে বিরাট ঘটনা হয়ে গেছে। কে জানে বাবা অফিস থেকে ফিরেও হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, শুভ্র, চশমা পাওয়া গেছে?

বাবা আজ ফিরতে এত দেরি করছেন কেন? তাঁর অফিসে আবারো কি কোন সমস্যা হয়েছে? শুভ্র তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বাবার ফিরতে দেরি হলে সে মাঝে মাঝে গেটের কাছে অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করতে তার ভাল লাগে।

ইয়াজুদ্দিন সাহেব রাত দশটায় ফিরলেন। বাড়িতে তখন এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি অফিসের কাপড়ে দোতলায় উঠেন না। একতলায় তিনি গরম পানিতে গোসল সারেন। নতুন এক সেট কাপড় এবং চটি জুতা পায়ে দোতলায় উঠেন। দোতলায় না উঠা পর্যন্ত সচরাচর কথা বলেন না। তাঁর সব কিছুই ঘড়ি ধরা। ডিনার খেতে বসেন ন'টা ত্রিশে। ঘুমুতে যান সাড়ে দশটায়।

আজ নিয়মে কিছু উলট-পালট হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ডাইনিং রুমে যখন ঢুকলেন তখন দশটা কুড়ি বাজে। শুভ্র একা বসে আছে। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। মতি মিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, তোমার মা কোথায় শুভ্র?

'মা শুয়ে আছে, বাবা। তার মাথা ধরেছে। রাতে কিছু খাবেন না।'

'তোমার না আজ বন্ধুর বিয়েতে যাবার কথা ছিল — যাওনি?

'না।'

'যাওনি কেন?'

শুভ্র বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এই হাসির অর্থ জানেন। এই হাসির অর্থ হচ্ছে শুভ্র এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে চায় না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক চামচ ভাত নিলেন। তিন-চার রকমের তরকারি আছে। কোনটিই তাঁর মনে ধরছে না। তিনি ডালের বাটির দিকে হাত বাড়ালেন। ডাইনিং রুমে শুধু তিনি এবং শুভ্র। মতি মিয়া চলে গেছে। এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে সব খাবার-দাবার টেবিলে সাজিয়ে কাজের লোকরা দূরে সরে যাবে। এই নিয়ম ইয়াজউদ্দিন সাহেবের করা। তিনি তাঁর জরুরি কথাবর্তা যা বলার তা খাবার টেবিলেই বলেন। তিনি চান না বাইরের কেউ এসব কথাবার্তা শুনুক।

'শুভ্র!'

'জ্বি।'

'তোমাদের রেজাল্ট কবে হবে — তুমি কিছু জান?'

'খুব শিগ্‌গিরই হবার কথা।'

'এখন কি করবে কিছু ভেবেছ?'

'না।'

'দেশের বাইরে গিয়ে যদি পড়াশোনা করতে চাও, করতে পার।'

'আমার বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।'

'কেন?'

শুভ্র আবারো হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, পড়াশোনা করার জন্য যেতে না চাও, বেড়াবার জন্যে যাও। এরপর আর সময় পাবে না।'

'সময় পাব না কেন?'

'আমি অবসর নেব বলে ভাবছি। এক জীবনে প্রচুর পরিশ্রম করেছি। এখন আর আগের মত পরিশ্রম করতে পারি না। পরিশ্রম করতে ভালও লাগে না। এক জীবনে সঞ্চয় যা করেছি তা আমার কাছে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। তোমাকে এই সঞ্চয় আমি বাড়াতে বলছি না। তুমি যা আছে তা শুধু ঠিক রাখবে।'

শুভ্র সহজভাবে বলল, তোমার কত টাকা আছে, বাবা?

'চট করে বলতে পারব না। তবে আমাকে দেখে বা আমার জীবনযাপন পদ্ধতি

দেখে আমার অর্থ-বিত্ত সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব না। আমি খুব লো প্রোফাইল মেইনটেইন করি।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার প্রচুর টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা তোমার কাছে কখনো ঝামেলা বলে মনে হয় নি?'

'টাকা ঝামেলা মনে হবে কেন? টাকার অভাবই ঝামেলা বলে মনে হয়েছে।'

শুভ্র কিছু বলতে গিয়েও বলল না। থেমে গেল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ?

'না।'

'বলতে চাইলে বলতে পার। আমি তোমার সঙ্গে ফ্রি ডিসকাশন করতে চাই। দেখ শুভ্র, আমি কঠোর পরিশ্রম করে টাকা করেছি। আমি মদ খাই না। জুয়া খেলি না। রিলাক্স করার জন্যে বিদেশের নাইট ক্লাবে যাই না। কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় জীবনযাপন করেছি — কেন করেছি বলে তোমার ধারণা?'

'কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করনি। তোমার স্বভাবই হচ্ছে এরকম। একেক মানুষ একেক রকম।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। হালকা গলায় বললেন, তোমার মা তোমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ঐদিন কি এক মেয়ের কথা বললেন। বিয়ের ব্যাপারে তুমি কি কিছু ভাবছ?

'না, কিছু ভাবছি না।'

'তোমার পছন্দের কেউ কি আছে? থাকলে বলতে পার।'

শুভ্র হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মতি মিয়া অপেক্ষা করছিল — টি কোজি ঢাকা চায়ের পট নিয়ে ঢুকল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ডিনারের পর পর হালকা লিকারে এক কাপ চা খান। শুভ্র বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার হাত ধোয়া হলে সে হাত ধুবে। শুভ্র বলল, তোমাকে একটা কথা বলা বোধহয় দরকার, বাবা, আমি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। আমার টাকা-পয়সার দরকার নেই।

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কি এ বাড়িতে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করছ?'

শুভ্র চুপ করে রইল। ইয়াজউদ্দিন তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, তোমার কি ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা আছে?

'হ্যাঁ আছে।'

'আমি কি জানতে পারি?'

'অন্য আরেকদিন বলব, বাবা।'

'আজ বলতে সমস্যা কি?'

'আজ তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনবে না। যে কোন কারণেই হোক আজ তুমি উত্তেজিত।'

'এসো চা খাই।'

দু'জন নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা হাতে বসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কোন একটা মজার কথা বলতে চাচ্ছেন। হালকা কোন রসিকতা। এনেক্‌ডোটস। চায়র টেবিলে এই কাজটা তিনি প্রায়ই করেন। আশ্চর্য! কোন রসিকতা মনে পড়ছে না। তিনি আসলেই উত্তেজিত।

'মতি! মতি মিয়া!'

মতি এসে দাঁড়াল। মতিকে কি জন্যে ডেকেছেন ইয়াজউদ্দিন সাহেব মনে করতে পারলেন না।

'ক'টা বাজে মতি?'

মতি বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। প্রশ্নটা অর্থহীন। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের হাতে ঘড়ি আছে, দেয়ালে ঘড়ি। এ বাড়ির এমন কোন ঘর নেই যেখানে দেয়ালে ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে না।

'স্যার, এগারোটা বাজে।'

'আচ্ছা যাও।'

শুভ্র বলল, বাবা, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? তুমি ঘামছ।

'শরীর খারাপ লাগছে না। গরম লাগছে। তুমি কি আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বারান্দায় বসবে?'

'অবশ্যই বসব।'

'অনেকদিন তোমার সঙ্গে কথা হয় না। আমি নিজে ব্যস্ত থাকি, তুমিও সম্ভবত ব্যস্ত থাক।'

'আমি তো ব্যস্ত থাকি না। আমার আসলে কিছুই করার নেই।'

'আমি শুনেছি সারাদিন তুমি বাসায় থাক না। কি কর?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, বাবা।'

'কেন?'

'কারণ নেই কোন। এম্নি।'

'কলাবাগানের এক বাসায় তুমি যাও। প্রায়ই যাও। কার বাসা?'

শুভ্র সহজ গলায় বলল, তুমি কি করে জানলে বাবা? ইয়াজউদ্দিন খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আমাকে খোঁজ-খবর রাখতে হয়। তুমি পৃথিবী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। যে কোন সময় ঝামেলায় পড়তে পার। বাবা হিসেবে এইটুকু সাবধানতা নেয়া অন্যায় নয় নিশ্চয়ই।

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছি না। আমার মজা লাগছে তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'তুমি কোথায় যাও না যাও সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট দেবার জন্যে আমি একজনকে বলেছিলাম। সে রিপোর্ট দিয়েছে। পড়তে চাও?'

'না।'

'কলাবাগানে তুমি যে বাসায় যাও সেটা কার বাসা?'

'রিপোর্টে কি লেখা নেই?'

'লেখা আছে তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'সাবেরের বাসা। সাবের কলেজে আমার সঙ্গে পড়তো। আই.এ. পাশ করার পর মারা যায়। আমি ঐ বাসায় যাই সাবেরের বাবার সঙ্গে গল্প করার জন্যে। উনার নাম মাহিন। উনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে।'

'ভদ্রলোক কি করেন?'

'স্কুল মাস্টার ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। ঘরেই থাকেন।'

'শুভ্র, তুমি খোলাখুলি সবকিছু আমাকে বলছ না। ভদ্রলোক প্যারালিসিস হয়ে দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে আছেন। এই খবর আমার কাছে আছে।'

'এই তথ্যটা অপ্রয়োজনীয় বাবা।'

'কোন তথ্যই অপ্রয়োজনীয় নয়। ঐ বাসায় মাহিন সাহেব ছাড়া আর কে থাকে?'

'তোমার রিপোর্টে কি লেখা নেই?'

'হ্যাঁ আছে। তারপরও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

শুভ্র বলল, তুমি বলছিলে বারান্দায় বসবে। চল বারান্দায় বসি। ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, মাহিন সাহেবের মেয়েটির প্রতি কি তোমার কোন দুর্বলতা আছে? এই ব্যাপারটা আমি তোমার কাছে থেকে খোলাখুলি জানতে চাই।

'আমি মাহিন সাহেবের সঙ্গে গল্প করার জন্যেই যাই। নীতু আপার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় না বললেই চলে।'

'তুমি মেয়েটিকে আপা ডাক?'

'হ্যাঁ। উনি সাবেরের তিন বছরের বড়।'

তারা দু'জন বারান্দায় এসে বসল। শুভ্র বলল, তুমি কি আর কিছু বলবে, বাবা?

'হ্যাঁ, বলব। তুমি বছর খানিকের জন্যে দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আস। তোমাকে এক বছরের ছুটি দেয়া হল। ফিরে এসে আমার সব দায়দায়িত্ব তুমি নেবে। একা একা ঘুরে বেড়ানোর মত অবস্থা তোমার না। আমার ধারণা, তুমি একা একা চিটাগাং থেকে ঢাকাও যেতে পারবে না। কাজেই তোমাকে একজন সফর সঙ্গি দেবার ব্যবস্থা করব। বিয়ে করে বৌ নিয়ে যাবে।'

'মেয়েও কি তুমি ঠিক করে রেখেছ?'

'না, এখনো ফাইন্যাল করিনি। তবে দু'-একজন যে নেই তাও না। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি — তোমার নিজের কোন পছন্দের মেয়ে থাকলে বলতে পার। তোমার মতামত গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হবে। রাত অনেক হয়েছে। যাও, শুয়ে পড়। আমার নিজেরো ঘুম পাচ্ছে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে পড়লেন। তিনি অবশ্যি সরাসরি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকলেন না। শোবার ঘরের লাগোয়া স্টাডি রুমে ঢুকলেন। নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় ঘুম চলেগেছে। সময়মত ঘুমুতে না গেলে তাঁর বড় ধরনের সমস্যা হয়। ঘুম-ঘুম ভাব থাকে। কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুম-ঘুম ভাব নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার কোন মানে হয় না। তিনি শুভ্রর উপর তৈরি করা রিপোর্ট নিয়ে বসলেন। যাকে রিপোর্ট তৈরি করতে দিয়েছিলেন তাকে মনে মনে কয়েকবার 'গাধা' বলে গালি দিলেন। তাঁর মনে হল রিপোর্টের কিছু-কিছু জায়গা বানানো। রিপোর্টের শুরুতেই লেখা — শুভ্র সাহেব বাড়ি থেকে বের হয়েই এক প্যাকেট সিগারেট কিনলেন।

শুভ্র তা করবে না। সে সিগারেট খায় না। অবশ্যি হতে পারে যে অন্য কারো জন্যে কিনেছে। মাহিন নামের ঐ ভদ্রলোকের জন্যে?

রেহানা স্টাডি রুমে ঢুকলেন। অবাক হয়ে বললেন, এত রাতে এখানে বসে আছ কেন? ঘুমুবে না?

'ঘুমুব।'

'এসো শুয়ে পড়ি। আমার নিজের শরীরও ভাল না। জ্বর এসেছে বলে মনে হয়।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, আচ্ছা, শুভ্র কি

সিগারেট খায়?

'না।'

'তুমি নিশ্চিত যে খায় না?'

রেহানা হাসিমুখে বললেন, ও কি করে না করে আমি জানব না?

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, না, ও কি করে না করে তুমি জান না।

৪

গলির ভেতর গাড়ি ঢোকে না।

শুভ্র গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে জাহেদের বাসার সামনে এল। জাহেদের বাসায় কোন কলিংবেল নেই। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়তে হয়। আজ কড়া নাড়তে হল না। বাড়ির বারান্দায় কাঠের চেয়ারে জাহেদ বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। সে এখনো ঝড় কটিয়ে উঠতে পারে নি।

ঝড়ের সূত্রপাত হয় গত রাতে। বিয়ের পর রাত এগারোটার দিকে কেয়াকে নিয়ে ছোটমামার বাড়িতে এসে উঠল। তার আশা ছিল — নতুন বৌ, কেউ কিছু বলবে না। নিতান্ত হৃদয়হীন মানুষও নতুন বৌয়ের সামনে হৃদয়হীনতা দেখাবে না। তাছাড়া মিজান সাহেব হৃদয়হীন নন। হৃদয়হীন হলে দীর্ঘদিন জাহেদকে পুষতেন না।

কেয়াকে গাড়ি থেকে নামানোর পর মিজান সাহেব যে কাজটা করলেন, তাকে কোন রকম নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় না। তিনি শীতল গলায় বললেন, জাহেদ, তোকে বউ নিয়ে এ বাড়িতে উঠতে নিষেধ করেছিলাম। তুই কি মনে করে উঠলি?

জাহেদ বলল, কাল চলে যাব, মামা।

'কালের কথা তো হয় নি। তুই এখন যাবি। এই মুহূর্তে যাবি।'

মনোয়ারা বললেন, আচ্ছা, তুমি চুপ কর তো। ও বউ নিয়ে ঘরে বসুক।

মিজান সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, শাট আপ। কোন কথা বললে খুন করে ফেলব। জাহেদ, তুই এক্ষুণি বউ নিয়ে বিদেয় হ। এক্ষুণি।

তিনি তাকাচ্ছেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে। তাঁর চোখ লাল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। তিনি থু করে একদলা থুথুও ফেললেন।

জাহেদ বলল, গাড়ি চলে গেছে, মামা। রাতও অনেক হয়েছে। বারোটার মত বাজে।

মিজান সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, গাড়ি ছাড়া তুই নড়তে পারিস না। কবে থেকে নবাব হয়েছিস? নবাবী কবে থেকে শিখেছিস? গাড়ি না থাকে রিকশায় যাবি। রিকশা না থাকলে হেঁটে যাবি। হারামজাদা কোথাকার!

মনোয়ারা কাঁদো–কাঁদো গলায় বললেন, কি হয়েছে তোমার! এরকম করছ কেন? ঘরে এসে বস তো। তিনি এসে স্বামীর হাত ধরলেন।

মিজান সাহেব ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিলেন। হুংকার দিয়ে বললেন — চুপ কর্ মাগী। তুই কোন কথা বলবি না। আমি তোর সাথে বাহাস করছি না।

জাহেদ পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। কেয়া অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তার ভয়-ভয় করছে। এ কী ভয়ংকর অবস্থা! জাহেদ বলল, কেয়া, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি একটা বেবীটেক্সি নিয়ে আসি।

মিজান সাহেব সহজ গলায় বললেন, দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? একটা চেয়ার এনে দে, বসুক। তুই গিয়ে বেবীটেক্সি নিয়ে আয়।

কেয়া বারান্দায় কাঠের চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে রইল। জাহেদ গেল বেবীটেক্সি আনতে। এই অবস্থা হবে জানলে শুভ্রের মাইক্রোবাসটা রেখে দিত। কেয়াকে নিয়ে সে এতরাতে যাবে কোথায় বুঝতে পারছে না। কোন একটা হোটেলে নিয়ে তুলবে? তুললেও মোটামুটি ভাল হোটেলে তুলতে হবে। ভাল হোটেলগুলি কোথায়? ভাড়াইবা কত?

আপার বাসায় যাওয়া যাবে না। আপা বিয়েতে আসে নি। জাহেদ শুভ্রের মাইক্রোবাস নিয়ে তাদের আনতে গিয়েছিল — সে চোখ-মুখ লাল করে বলেছে, তুই আমাকে নিতে এসেছিস? তোর এত বড় সাহস? তুই তোর দুলাভাইকে বলে গেছিস — আমি তোর গলার হার চুরি করেছি। তারপরেও আমাকে নিতে এসেছিস।

জাহেদ বলল, আমি তো এমন কথা কখনো বলিনি, আপা?

'তাহলে তোর দুলাভাই মিথ্যা কথা বলছে? আমি হলাম চোর, আর তোর দুলাভাই মিথ্যাবাদী? বের হ বাড়ি থেকে। বের হ বললাম।

বেবীটেক্সিতে উঠার সময় কেয়া বলল, কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ? জাহেদ অস্পষ্ট একটা শব্দ করল। কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, আমাকে বড় আপার বাসাতেই রেখে এসো। পরে একটা কোন ব্যবস্থা হবে। প্রচন্ড মাথা ধরেছে।

জাহেদ বলল, আচ্ছা।

জাহেদ জড়সড় হয়ে বসে আছে। কেয়া হাত বাড়িয়ে জাহেদের হাত ধরল। কোন কথা বলল না। জাহেদ বলল, কেয়া, আমি খুব লজ্জিত।

কেয়া বলল, তোমার মামা কি অসুস্থ?

জাহেদ বলল, না। মামা খুবই সুস্থ। আজ এরকম কেন করলেন কিছু বুঝতে পারছি না।

'আমার মনে হয় তোমার মামা অসুস্থ। তাঁকে ভেতরে নিয়ে মাথায় পানি ঢালছিল।'

'তুমি সারাক্ষণ বাইরেই বসেছিলে?'

'হুঁ। একবার ভেবেছিলাম ভেতরে যাব। তারপর মনে হল, আমাকে দেখে রেগে যান কি-না। তুমি এক কাজ কর — আমাকে রেখে বাসায় চলে এসো। তোমার মামার কি অবস্থা দেখ। হয়ত তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

জাহেদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কেয়া বলল, ইচ্ছা করলেও আমি আপার বাসায় তোমাকে রাখতে পারব না। বাসায় ফিরে আপাকে কি বলব তাই বুঝতে পারছি না। কি বলা যায় বল তো?

জাহেদ কিছু বলল না। অসংখ্য কথা সে জমা করে রেখেছিল আজ রাতে বলার জন্যে। কোন কথাই এখন মনে পড়ছে না। মনে পড়লেও বলা সম্ভব না। কেয়া বলল, তুমি মন খারাপ করো না। আমাদের জীবনের শুরুটা খারাপ হয়েছে — শেষটা ভাল হবে। আমার মন বলছে ভাল হবে।

ফ্ল্যাটবাড়ির কলাপসিবল গেট লাগিয়ে ফেলেছে। অনেক ডাকাডাকির পর গেট খোলা হল। কেয়া বলল, তোমার উপরে আসার দরকার নেই। তুমি এই বেবীটেক্সি নিয়েই বাসায় চলে যাও। কেয়া অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। বিয়ের শাড়িতে তাকে যে কি অপূর্ব লাগছে তা কি সে জানে?

বাসায় ফিরে জাহেদ দেখে সবকিছুই স্বাভাবিক। মামা ভেতরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। মামার দুই মেয়ের ছোটটি ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়টি বাবার পাশে বসে আছে। মিজান সাহেব বললেন, জাহেদ, চা খাবি?

জাহেদ বলল, না।

'বৌমাকে কোথায় রেখে এসেছিস? তার বোনের বাড়ি?'

'হুঁ।'

'ভাল হয়েছে। তুই হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। বিয়েবাড়ির ধকল গেল। টায়ার্ড হয়েছিস নিশ্চয়ই। টায়ার্ড হবারই কথা। বরং এক কাজ কর — চা খা। চা খেয়ে তারপর ঘুমুতে যা। চা খেলে শরীরের টায়ার্ড ভাবটা কমবে। আমি চা খাওয়া কখন ধরি জানিস? — বিয়ের রাতে। এর আগে কোনদিন চা খাইনি . . . হা হা হা।'

জাহেদ বলল, মামা, তোমার শরীর কি খারাপ?

'না, শরীর ঠিক আছে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের কিছু কষ্ট হয়। আজ হচ্ছে না। ভাল আছি। বেশ ভাল আছি। তুই তাহলে শুয়ে পড়। আমি ঘুমুতে যাই।'

রাত দু'টার দিকে জাহেদ ক্যাম্পখাটে ঘুমুতে এল। সে নিশ্চিত, আজ রাতে তার ঘুম আসবে না। কিন্তু বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। সে ভোর ন'টা

পর্যন্ত ঘুমুল। ঘুম ভেঙে দেখে মামা বারান্দায় বেশ আয়োজন করে দাড়ি শেভ করতে বসেছেন। বাটিতে গরম পানি, সামনে আয়না। তিনি জাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তোর ঘুম ভাঙল?

'হুঁ।'

'তুই পুরো সাতঘণ্টা ঘুমিয়েছিস। ঘুমুতে গেছিস রাত দু'টায়। এখন বাজে ন'টা। কাঁটায় কাঁটায় সাতঘণ্টা। মানুষের ঘুম দরকার ছ'ঘণ্টা। তুই একঘণ্টা এক্সট্রা ঘুমিয়েছিস।'

জাহেদ বলল, তুমি আজ অফিসে যাবে না, মামা? আটটার সময়ই তো অফিসে চলে যাও।

মিজান সাহেব শরীর দুলিয়ে হাসলেন। যেন জাহেদ খুব হাসির কথা বলছে।

'রাতে তোর ঘুম কেমন হয়েছে?'

'ভাল।'

'আমার ঘুম ভাল হয়নি। বুঝলি — যখনি ঘুম আসে তখনি তোর মামী বলে, আস তোমার মাথায় একটু পানি ঢেলে দেই। তার ধারণা হয়েছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাল রাতে বৌমার সামনে হৈচৈ করলাম — তোর মামীকে মাগী–ছাগী ডাকলাম — সেই থেকে ভেবে বসে আছে, আমার মাথা খারাপ। পানি ঢাললে যদি মাথা ঠিক হত তা হলে কি দেশে এত পাগল থাকত? পানি ঢেলে সব পাগল ঠিক করে ফেলা যেত। আমার মাথা ঠিকই আছে। গত রাতে হৈচৈ আমি ইচ্ছা করে করেছি এবং আমি ঠিকই করেছি। হৈচৈ না করলে বৌ নিয়ে তুই স্থায়ী হয়ে যেতি। আর হৈচৈ যে করব সেটা তো আগেই বলে দিয়েছি। বলিনি আগে?'

জাহেদ চুপ করে রইল। রান্নাঘর থেকে মামীর কান্নার শব্দ আসছে। বড় মেয়েটা মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে বাবাকে উঁকি দিয়ে দেখে চট করে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে খুব ভয় পেয়েছে। মামার মাথা সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে কি–না জাহেদ বুঝতে পারছে না। কথা বেশি বলছেন। ক্রমাগতই কথা বলছেন। ক্রমাগত কথা বলা কি পাগলের লক্ষণ? হতে পারে।

মিজান সাহেব দাড়ি শেভ করে টিফিন বক্সে খাবার নিয়ে অফিসে রওনা হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক মানুষ। মোড়ের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনলেন, পান কিনলেন। একটার দিকে অফিসের দু'জন সহকর্মী তাঁকে বাসায় নিয়ে এলেন। তাঁরা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, উনার শরীরটা বোধহয় আজ ভাল না। কয়েকদিন বিশ্রাম করা দরকার। জাহেদ বলল, কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, তেমন কিছু না। একটু মাথা গরমের মত হয়েছে ; কয়েকটা জরুরী ফাইল ছিড়ে ফেলেছেন। আমরা

ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুমের অষুধ দিয়েছে। অষুধ খাইয়ে দিয়েছি। ভাল ঘুম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বিছানায় শুইয়ে রাখুন। ঘুমিয়ে পড়বেন। বেবীটেক্সীতেও ঘুমুচ্ছিলেন।

মিজান সাহেব তখন থেকেই ঘুমুচ্ছেন। মনোয়ারা কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। মেয়েরা এখনো কিছু জানে না। তারা স্কুলে। জাহেদ বারান্দায় কাঠের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। কেয়ার খোঁজে একবার যাওয়া উচিত, তাও যায় নি। শুভ্রকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। শুভ্র বলল, তোর কি হয়েছে? এমন লাগছে কেন?

জাহেদ বলল, মনটা খুব খারাপ। মামার শরীর ভাল না।

'কি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।'

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, তোর বিয়েতে আসতে পারিনি। কিছু মনে করিসনি তো? চশমা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে?

'অনুষ্ঠান আবার কি? আমি তিনবার কবুল কবুল বললাম। কেয়া তিনবার বলল। ব্যস। মামলা ডিসমিস। চা খাবি শুভ্র?'

'খাব।'

'বাসায় চা খাওয়ানোর কোন উপায় নেই। মামী সিরিয়াস কান্নাকাটি করছে। চল্, মোড়ের দোকানটায় চা খাব।'

শুভ্র জাহেদের পেছনে পেছনে যাচ্ছে। বিয়েতে সে উপস্থিত হতে না পারায় জাহেদ যে রাগ করেনি তাতেই শুভ্র আনন্দিত।

'জাহেদ!'

'হু?'

'কেয়া কোথায়? কেয়ার সঙ্গে একটু দেখা করব ভেবেছিলাম।'

'ও তার বোনের বাসায়। এখানে এত যন্ত্রণা, এর মধ্যে আর তাকে আনি নি।'

'তোর মামার অসুখটা কি?'

'এখনো ঠিক জানি না। মাথা গরম হয়ে গেছে। অফিসের ফাইল টাইল ছিড়ে ফেলেছে। দুঃখ-ধান্দার মধ্যে থাকলে যা হয়। বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়নি ছ'মাসের। প্রভিডেন্ট ফান্ডে এক পয়সা নেই। লোন নিয়ে নিয়ে সব শেষ। এক লোকের কাছ থেকে মামা দশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন। সেই লোক দু'-তিন দিন পর পর বাসায় এসে বসে থাকে। তাকে দেখলেই মামার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। সব মিলিয়ে ভয়াবহ অবস্থা। তুই বুঝবি না। আয়, চা খাব।'

'কেয়া তার বোনের বাসায় ক'দিন থাকবে?'

'থাকবে কিছুদিন। এদিকের ঝামেলা না সামলে তো আনতেও পারছি না।'

'কেয়ার বোনের বাসার ঠিকানাটা আমাকে দিবি?'

'কেন?'

'তোদের বিয়েতে আমি একটা উপহার দেব। সামান্য উপহার । তবে কেয়ার খুব পছন্দ হবে। কাজেই তাকে দিতে চাই।'

'উপহারটা কি?'

'তোকে বলব না। তুই আমাকে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দে।'

'এখন যাবি?'

'না, এখন যাবে না। এখন যাব মাহিন সাহেবের কাছে। সাবেরের বাবা মাহিন সাহেব। আমি প্রায়ই উনার কাছে যাই।'

জাহেদ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, জানি। তুই মোটামুটি একটা স্ট্রেঞ্জ চরিত্র। আরেক কাপ চা খাবি, শুভ্র? চা-টা ভাল হয়েছে। খা আরেক কাপ। বলব দিতে?

'বল।'

'তোর মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে ঐদিন কোন বখশিশ-টখশিশ দেইনি। দেয়া উচিত ছিল। বেচারা নিশ্চয়ই এক্সপেক্ট করেছে। টাকাই নেই, বখশিশ কি দেব! খেতে বললাম। খেল না। বড়লোকের ড্রাইভার গরীবের বাড়িতে বোধহয় খায়ও না। বেশি জোরাজুরি করতেও সাহস হল না।

শুভ্র কিছু বলল না। সে নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। সে জাহেদের জন্যে দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছে। কিভাবে তাকে দেবে বুঝতে পারছে না। তার লজ্জা-লজ্জা লাগছে। জাহেদ আবার যদি কিছু মনে করে! শুভ্র শেষ পর্যন্ত টাকা না দিয়েই চলে এল। জাহেদ তাকে এগিয়ে দিতে গাড়ি পর্যন্ত এল এবং এক সময় বলল, তুই যে কত ভাল একটা ছেলে তাকি জানিস?

৫

এ বাড়ির কলিংবেলটা নষ্ট। টিপলে কোন শব্দ হয় না। মাঝে মাঝে শক করে। শুভ্র কলিংবেল টিপেই বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল। কলিংবেলে কোন শব্দ হল না, কিন্তু ভেতর থেকে মাহিন সাহেবের গলা শোনা গেল। তিনি উল্লসিত স্বরে বললেন, শুভ্র এসেছে। দরজা খুলে দে।

নীতু বাবাকে সকালের নাশতা খাইয়ে দিচ্ছে। পাতলা খিচুড়ি। চামুচে করে মুখে তুলে দিতে হচ্ছে। মাহিন সাহেব দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছেন। ন'টা বেজে গেছে। বাবাকে নাশতা খাইয়ে নীতু অফিসে যাবে। এইসময় বাসে উঠাই এক সমস্যা। আজো হয়ত অফিসে দেরি হবে। বাবা দ্রুত নাশতা খাচ্ছেন না। এক এক চামুচ মুখে নিয়ে অনেক দেরি করছেন। খিচুড়ি খাওয়ানো হলে চা খাওয়াতে হবে। চা খেতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া করলেই বাবা বলবেন — তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে রে নীতু। তুই চলে যা। চা আজ আর খাব না।

মাহিন সাহেব বললেন, শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে, দরজা খুলে দে।

'শুভ্র তুমি বুঝলে কি করে?'

'আমার স্মেলিং সেন্স খুব ডেভেলপ করেছে। আমি ওর গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। চোখ যত নষ্ট হচ্ছে ঘ্রাণশক্তি তত বাড়ছে।'

'তোমার চোখ মোটেই নষ্ট হচ্ছে না। সব সময় আজেবাজে চিন্তা করবে না। নাও, হা কর।'

'দরজা খুলে দিয়ে আয়।'

'কেউ আসেনি, বাবা। এলে দরজার কড়া নাড়ত।'

দরজার কড়া নড়ল। নীতু বিরক্তমুখে খিচুড়ির বাটি নামিয়ে দরজা খুলতে গেল। মাহিন সাহেব বললেন, আমার নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে। তুই অফিসে চলে যা। চা আজ আর খাব না। আমার চা-টা বরং শুভ্রকে দে।

নীতু দরজা খুলল। শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে। নীতু শুকনো গলায় বলল, এসো শুভ্র। আজ তুমি কতক্ষণ থাকবে?

'কেন বলুন তো?'

'বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। বাবার শরীর ভাল না। তুমি যতক্ষণ থাকবে বাবা কথা বলতে থাকবেন। উনার দু'রাত ঘুম হয়নি। ঘুম দরকার।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না।'

'কিছু মনে করলে না তো?'

'না।'

'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথাও আছে। তুমি কি আমার অফিসে একবার আসতে পারবে?'

'পারব। কবে আসব?'

'আজই আস না। বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে চলে এসো।'

'আচ্ছা।'

শুভ্র মাহিন সাহেবের শোবার ঘরে ঢুকল। ঠিক ঘর না, এটা এ বাড়ির স্টোর রুম। মাহিন সাহেব অসুস্থ হবার পর এই ঘর থাকার জন্যে বেছে নিয়েছেন। কোন মতে একটা খাট এঘরে পাতা হয়েছে। আর কোন আসবাব রাখার জায়গা নেই। ঘরে একটি টেবিল ফ্যান আছে। সেই ফ্যান মাথার কাছে খাটের উপর বসানো। ঘরে জানালা নেই। ভেন্টিলেটারটা সাধারণ ভেন্টিলেটরের চেয়ে বড় বলে কিছু আলো-বাতাস ঢুকে।

মাহিন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, কেমন আছ শুভ্র?

'ভাল আছি।'

'আরাম করে পা তুলে বস। চাদর পরিস্কার আছে। নীতু আজই চাদর বদলেছে। আমি জানতাম তুমি আসবে। তাই চাদর বদলাতে বললাম।'

শুভ্র পা তুলে বসল। নীতু চা নিয়ে ঢুকল। শুভ্র'র সামনে রাখতে রাখতে বলল, তুমি যাবার সময় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাবে। কয়েকদিন অফিসে যাবার সময় বাসায় তালা দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাসায় বাবা ছাড়া কেউ নেই। বাড়িওয়ালার কাছে একটা চাবি আছে। তিনি একবার এসে খোঁজ নিয়ে যান। তালা আমাদের বসার ঘরে টেবিলের উপর আছে। শুভ্র, পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

মাহিন সাহেব উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। দু'সপ্তাহ শেভ করা হচ্ছে না বলে মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। গায়ের চাদরও সাদা রঙের বলে তাঁকে ঋষি-ঋষি দেখাচ্ছে।

'চায়ে চিনি হয়েছে শুভ্র?'

'হয়েছে। আপনার শরীর আজ কেমন?'

'অসম্ভব ভাল।'

'রাতে নাকি ঘুম হয় নি?'

'রাতে আমার কখনো ঘুম হয় না। এরা জানে না। এই বয়সে ঘুম না হওয়া কোন বড় ব্যাপার না। শোন শুভ্র, তোমার সঙ্গে আমি এখন খুব জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলব। খুব জরুরি। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিদ্ধান্ত তোমাকে জানাব। খুব মন দিয়ে শোন।'

'আপনার সব কথাই আমি খুব মন দিয়ে শুনি।'

'একমাত্র তুমিই শোন। আর কেউ শুনে না। দেখ শুভ্র, আমি এই সংসারে উপদ্রবের মত আছি। পক্ষাঘাত সারার কোন সম্ভাবনা নেই। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আগে বাঁ হাতটা নাড়াতে পারতাম, এখন তাও পারি না। শরীর অসুস্থ হলে মনও অসুস্থ হয়। আমার মনও এখন অসুস্থ। রাত–দিন চেঁচামেচি করি। আমার চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে আমার স্ত্রী এক সপ্তাহ ধরে তাঁর ভাইয়ের বাসায় আছেন। কাজের মেয়ে ছিল। সে পালিয়েছে তিনদিন আগে। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ?'

'শুনছি।'

'আমি এদের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে আছি। সিন্দাবাদের ভূত। এরা আমাকে কি করে ঘাড় থেকে নামাবে বুঝতে পারছে না।'

'এরা আপনাকে ঘাড় থেকে নামাতে চাচ্ছে এরকম মনে করছেন কেন?'

'মনে করাই তো স্বাভাবিক। নীতু বিয়ে করতে পারছে না আমার জন্যে। একটা ছেলের সঙ্গে তার ভাব–টাব হয়েছে বলে মনে হয়। ওদের অফিসেই কাজ করে। কয়েকবার এ বাড়িতে এসেছে। কখনো আমার সঙ্গে দেখা করেনি। নীতুর সঙ্গে গল্প করে চা–টা খেয়ে চলে গেছে। আমি যতদিন বেঁচে আছি নীতু বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারবে না। এটা হল বাস্তব কথা। আমি ওদের মুক্তি দিতে চাই। বুঝলে শুভ্র? চির মুক্তি!'

'কিভাবে?'

'সেটা নিয়েই ভাবছি। আত্মহত্যা সহজ পথ, তবে খুবই নিম্নমানের পথ। আত্মহত্যা খুনের চেয়েও খারাপ। খুন করার পর অনুশোচনার একটা সুযোগ থাকে। আত্মহত্যার পর সেই সুযোগও থাকে না।'

'আপনি কি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন?'

'এখনো ভাবছি না। অন্য পথ আর কি আছে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছি না। আমি হয়েছি পরাশ্রয়ী। নিজে নিজে খেতে পারি না। অন্যকে খাইয়ে দিতে হয়। আমার কোন উপার্জন নেই। বেঁচে থাকার জন্যে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সবদিক রক্ষা হত। চট করে তা হবে বলে মনে

হয় না। আমার মানসিক শক্তি এখনো প্রবল। আমার মনে হচ্ছে, স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে আরো সাত-আট বছর অপেক্ষা করতে হবে। সাত-আট বৎসর নীতু আমার জন্যে অপেক্ষা করবে — এটা উচিত না।'

শুভ্র বলল, আপনার জন্যে সিগারেট এনেছি। ধরিয়ে দেব?

'দাও।'

শুভ্র সিগারেট ধরিয়ে মাহিন সাহেবের ঠোঁটে গুঁজে দিল। তিনি ধোঁয়া ছেড়ে তৃপ্তির গলায় বললেন; বেঁচে থাকতে আমার এখনো ইচ্ছা করে। এই যে ধোঁয়ার সঙ্গে নিকোটিন নিচ্ছি —শরীর আরাম পাচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথা বলছি তাতেও আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দের ব্যাপার এখনো আছে তবে তাকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে কি-না সেটাই বিচার্য। সমস্ত জীবজগতের একটা সহজ নিয়ম আছে। অসুস্থ, দুর্বল, অক্ষম কাউকে জীবজগৎ সহ্য করে না। সাধারণত তাকে মেরে ফেলে কিংবা এমন ব্যবস্থা করে যেন মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। একটা কাক অসুস্থ হলে অন্য কাকরা কি করে জান?'

'না।'

'তাকে ঠুকরে ঠুকরে মেরে ফেলে। অসুস্থ কাক কোন প্রতিবাদ করে না। চুপ করে বসে থাকে।'

'আপনি তো কাক না। আপনি মানুষ।'

'মানুষ হলেও আমি সমগ্র জীবজগতেরই একটা অংশ। জীবজগতের সবার জন্যে যা সত্যি — তা আমার জন্যেও সত্যি।'

'চাচা, আমার মনে হয় কোন কারণে আপনার মন-টন খারাপ বলে এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা করছেন।'

'সহজে আমার মন খারাপ হয় না। তবে এখন হচ্ছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রেগে যাচ্ছি। এগারোই সেপ্টেম্বর দিন সাবেরের মৃত্যুদিন। এরা দেখি এই দিনটার কথা ভুলে গেছে। কারোর মনেই নেই কি অসম্ভব যন্ত্রণা নিয়ে ছেলেটা আমার কোলে মারা গেল!'

'অনেক দিনের ব্যাপার চাচা।'

'হ্যাঁ, অনেক দিনের ব্যাপার। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ বিস্মৃতিপরায়ণ। ভুলে যাবার মধ্যেও সে আনন্দ পায়। কিন্তু তুমি তো ভুল নি শুভ্র। তুমি তো ঠিকই উপস্থিত হয়েছ। হও নি? আজ কত তারিখ শুভ্র — এগারোই সেপ্টেম্বর না?'

শুভ্র খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় বলল, ও আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। ওর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

'ও ছিল তোমার বন্ধু। কিন্তু সে ছিল এ পরিবারের একজন। এরা কেন তাকে ভুলে যাবে!'

'ভুলবে কেন। কেউ ভুলেনি।'

'সান্ত্বনা দেয়া কথা আমার ভাল লাগে না। তুমি সান্ত্বনার কথা আমাকে বলবে না। আমার এই ছেলেটির কথা কারো মনে নেই। মনে থাকলে এরা বুঝত কেন এই স্টোররুমে আমি থাকি। এদের ধারণা, আমি এখানে থাকি সবাইকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে। কেউ বুঝতে চেষ্টা করে না — এটা আমার ছেলের ঘর। সে এখানে থাকতো। ফ্যান নেই, আলো-বাতাস নেই —ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতো। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আস — আমার এত ভাল লাগে! আমি আমার ছেলের ছায়া তোমার মধ্যে দেখি। ছেলেটা মরার সময় তুমি ছিলে না। ওর যন্ত্রণা যখন খুব তীব্র হত তখন সে আমাকে বলতো, বাবা, শুভ্র যদি আসে ওকে ঘরে ঢুকতে দিও না। ও মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ও আমাকে দেখে কষ্ট পাবে।'

মাহিন সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। শুভ্র অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। মাহিন সাহেব বললেন, আজ তুমি যাও। দরজায় তালা দিয়ে যাও।

'আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দেব?'

'দাও।'

শুভ্র আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে মাহিন সাহেবের ঠোঁটে গুঁজে দিল।

'চাচা যাই?'

'আচ্ছা যাও। মে গড বি অলওয়েজ উইথ ইউ।'

নীতু মাথা নিচু করে টাইপ করে যাচ্ছে। সেকশনাল ইনচার্জ পরিমল বাবু একগাদা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেছেন, লাঞ্চের আগে শেষ করতে পারবেন না? নীতু হতাশ চোখে কাগজগুলির দিকে তাকিয়েছে। লাঞ্চের আগে শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না। মুখের উপর না বলাও সম্ভব না।

'একটু স্পীডে টাইপ করে যান। মন লাগিয়ে স্পীডে করলে লাঞ্চের আগেই পারবেন। তিনটা করে কপি করবেন।'

নীতু কথা বলে সময় নষ্ট করল না। টাইপ শুরু করল। তার স্পীড ভাল। কিন্তু আজ স্পীড উঠছে না। শুভ্র চলে আসতে পারে। আজ না এলে ভাল হত। যদি আসে সে কি করবে! চলে যেতে বলবে? অন্য একদিন আসতে বলবে? শুভ্রের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

এক ঘণ্টা নীতু সমান তালে টাইপ করে গেল। মুহূর্তের জন্যেও থামল না।

এখনো একগাদা কাগজ সামনে। পাচজন টাইপিস্ট আছে। কাগজগুলি সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়া যেত . . .

''নীতু আপা !'

কেয়া মুখ তুলে তাকাল। ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি এসেছ?

'জ্বি।'

'চল, ক্যানটিনে গিয়ে বসি।'

নীতু উঠে দাঁড়াল। পাশের টেবিলের ইদরিস সাহেবকে বলে গেল সে ক্যান্টিনে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরবে।

'তালাবন্ধ করে এসেছ শুভ্র?'

'জ্বি।'

'অসুস্থ একজন মানুষকে তালাবন্ধ করে রেখে আসতে হচ্ছে। চিন্তা করতেই খারাপ লাগে। ব্যবস্থাটা অবশ্যি সাময়িক।'

ক্যান্টিন ফাঁকা। নীতু কোণার দিকের একটা চেয়ারে বসল। নোংরা ক্যান্টিন। মনে হচ্ছে তিন-চারদিন ধরে মেঝে ঝাঁট দেয়া হচ্ছে না। টেবিলে টেবিলে চায়ের কাপ। মাছি উড়ছে।

'কিছু খাবে শুভ্র?'

'জ্বি না।'

'এরা খুব ভাল সিঙ্গারা বানায়। আমি লাঞ্চে দু'টা সিঙ্গারা আর এক কাপ চা খাই। খেয়ে দেখো না।'

'আচ্ছা বলুন, সিঙ্গারা দিতে বলুন।'

নীতু উঠে গিয়ে সিঙ্গারা নিয়ে এল। শুধু সিঙ্গারা নয়, এক বোতল পেপসিও আছে।

'শুভ্র, পেপসি খাও তো তুমি?'

'জ্বি খাই।'

'খুব ঠাণ্ডা হবে না। সিঙ্গারা খেয়ে পেপসিটা খাও। এখানকার পানি ভাল না।'

'কি জন্যে ডেকেছেন, আপা?'

'বাবা সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। তুমি তো প্রায়ই বাবার সঙ্গে কথা বল। আজও বললে, কিছু বুঝতে পারছ? কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?

'জ্বি-না। কি পরিবর্তনের কথা বলছেন?'

'বাবার মাথা ঠিক নেই, শুভ্র। বাসায় তালা দিয়ে আসার এও একটা কারণ। আমাদের বাড়িতে এমন কিছু মহামূল্যবান কোহিনুর নেই যে ঘর তালাবন্ধ করে

আসতে হবে। বাবার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'উনি কি করেন?'

'এখনো কিছু করছেন না। তবে খুব শিগ্‌গিরই করবেন। বাবা হুট করে কিছু করেন না। কোন একটা বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনা করেন। তারপর কাজটা করেন। তখন হাজার যুক্তি দিয়েও তাঁকে টলানো যায় না। এখন তিনি কি ভাবছেন শুনবে? এখন ভাবছেন তিনি আমাদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে আছেন। তিনি আমাদের মুক্তি দিতে চান। তোমাকেও নিশ্চয়ই বলেছেন।'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

'মা'র সঙ্গে এই নিয়ে ঝগড়া হল। মা কান্নাকাটি করে বাসা ছেড়ে চলে গেছেন। এখন মা ছোটমামার সঙ্গে আছেন। মা'কে কি বলেছেন শুনবে?'

'বলুন।'

'মা'কে বলেছেন — আমি তোমাদের কাছে বিরাট বোঝা। আমার জন্যে নীতুর বিয়ে হচ্ছে না। আমি চাই না আমার জন্যে আমার মেয়ের জীবন নষ্ট হোক। কাজেই আমি ঠিক করেছি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তুমি আমাকে লোকজন বেশি চলাচল করে এমন একটা রাস্তার পাশে শুইয়ে রেখে এসো। এ শহরে খুব কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার ভিক্ষুক বাস করে। রোড এ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়, অনাহারে ভিক্ষুকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় না। আমি এইভাবে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারব বলে আমার ধারণা। মা বললেন, তোমাকে মুখে তুলে কে খাইয়ে দেবে? বাবা বললেন, তিনি পার্টনারশীপ ব্যবস্থায় আরেকজন অল্পবয়স্ক শিশু ভিক্ষুক সঙ্গে নেবেন। বাবার রোজগারের অর্ধেক সে পাবে। বিনিময়ে বাবাকে সে খাইয়ে দেবে। বাবার মাথা যে পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে তুমি কি বুঝতে পারছ? তুমি চিন্তা করতে পার — এই লোক ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছে!

শুভ্র বলল, এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে চাচা হঠাৎ করে মনে করা শুরু করলেন যে তিনি বাড়তি বোঝা।

'বাবা তো বোকা না শুভ্র। বাবা যথেষ্টই চালাক। তাছাড়া শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের বুদ্ধি হঠাৎ করে অনেকখানি বেড়ে যায়। বাবা এক ধরনের বোঝা তো বটেই। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। তবু তোমাকে বলি — আমার বিয়ে করার একটা সুযোগ ঘটেছে। কোনদিন ঘটবে আমি ভাবিনি, কিন্তু ঘটেছে। আগে একবার বিয়ে হওয়া মেয়ের আবার বিয়ে ঠিক হওয়া বড় ঘটনা। যার সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়েছে — তার মা-বাবা আছে। ছোট ভাইবোন আছে। আমি তো বিয়ের পর মা-বাবাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে উঠতে পারি না।'

'উনি তো আপনার সমস্যা জানেন। উনি কি বলছেন?'

'সে কিছুই বলছে না। আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলছি। কতদিন সে অপেক্ষা করবে? তাছাড়া অপেক্ষা করবেই বা কেন?'

শুভ্র পেপসির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, আপনি তাঁকে অপেক্ষা করতে বলছেন কেন? আপনার কি ধারণা অপেক্ষা করলেই সমস্যার সমাধান হবে?

'তাকে অপেক্ষা করতে বলা ছাড়া আমি আর কি বলতে পারি?'

'আপনার কাছে কি এই সমস্যার কোন সমাধান আছে?'

'না।'

শুভ্র ইতস্তত করে বলল, আমাকে আপনি কি করতে বলছেন?

নীতু অসহিষ্ণু গলায় বলল, তোমাকেও কিছু করতে বলছি না। তুমি আবার কি করবে? তোমার জানা থাকা দরকার বলেই জানালাম। তুমি ইচ্ছা করলে পাগলামি চিন্তা-ভাবনা না করার জন্যে বাবাকে বলতে পার।

'জ্বি আচ্ছা, আমি বলব।'

'শুভ্র, আমি বসতে পারব না। আমার অনেক কাজ আছে। আরেকদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব। নীতু উঠে দাঁড়াল। শুভ্র লক্ষ্য করল নীতুকে আসলেই খুব ক্লান্ত লাগছে। মুখে বয়সের দাগ পড়ে গেছে। চোখের নিচটা কালো হয়ে আছে।

নীতু চলে যাবার পরও শুভ্র খানিকক্ষণ বসে রইল। ক্যান্টিনে লোকজন আসতে শুরু করেছে। এখন বোধহয় লাঞ্চ টাইম। বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না।

৬

দুপুরের খাবার ইয়াজউদ্দিন সাহেব অফিসেই খান। খুব হালকা খাবার। এক বাটি স্যুপ। সামান্য সালাদ। এক টুকরা পাকা পেপে কিংবা অর্ধেকটা কলা। খাবার শেষে মগের মত বড় একটা গ্লাসে এক মগ দুধ–চিনিবিহীন চা। চায়ের সঙ্গে দিনের দ্বিতীয় সিগারেটটি খাওয়া হয়। আজ তাঁর লাঞ্চ ঠিকমত খাওয়া হয়নি। দু' চামচ স্যুপ মুখে দিয়ে বাটি সরিয়ে রেখেছেন। সালাদ খান নি। পেপের টুকরার দু'খণ্ড মুখে দিয়েছেন। চায়ের মগ সামনে আছে। ঠাণ্ডা হচ্ছে, তিনি চুমুক দিচ্ছেন না। পর পর তিনটি সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি প্রচণ্ড টেনশান অনুভব করছেন, যদিও আচার–আচরণে তা প্রকাশ পাচ্ছে না। তাঁর সামনে এ সপ্তাহের নিউজ উইক। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স–এর উপর একটি প্রবন্ধ পড়ছেন। মন দিয়েই পড়ছেন।

তাঁর টেনশানের কারণ হচ্ছে — তিনি খবর পেয়েছেন আজ তাঁকে অফিস থেকে বের হতে দেয়া হবে না। অফিস ছুটি হবার পর কর্মচারীরা তাঁকে ঘেরাও করবে। দরজা আটকে তালা দিয়ে দেবে। তাঁর টঙ্গী সিরামিক কারখানার কর্মচারীরাও এসে যোগ দেবে। তাদের ন'দফা দাবীর সব ক'টি তাঁকে মেটাতে হবে। আজ ভয়ংকর কিছু ঘটবে — এ ব্যাপারে কর্মচারীরা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে তারা নিশ্চিত যে ইয়াজউদ্দিন সাহেব এখন পর্যন্ত কিছুই জানেন না। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কর্মচারী সমিতির সব খবরই রাখেন। নেতাদের গোপন বৈঠকের খবরও তিনি জানেন। আজকের ঘেরাওয়ের ব্যাপারে তিনি কি করবেন এখনো ঠিক করেন নি। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। হাতে সময় আছে। এরা প্রথম যা করবে তা হল — টেলিফোনের লাইন কেটে দেবে যাতে তিনি প্রয়োজনের সময় টেলিফোনে পুলিশের সাহায্য না চাইতে পারেন। পুলিশকে আগেভাগে জানিয়ে রাখা যায়, তবে তা করা ঠিক হবে না। পুলিশের কাছ থেকেই ওরা জেনে যাবে। এমন ব্যবস্থা করে রাখতে হবে যাতে পুলিশ ঠিক চারটার সময় খবর পায়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব মুনিরুল হককে ডেকে পাঠালেন। মনিরুল হক কর্মচারী সমিতির সংস্কৃতি সম্পাদক। আজকের ঘেরাও আন্দোলনের সেই হচ্ছে প্রধান ব্যক্তি। প্রতিটি কাজ সে করছে আড়ালে থেকে। ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে — ঘেরাও

এর এক পর্যায়ে সে রেকর্ড রুমে আগুন লাগিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা করেছে। এটি কেন করছে তিনি জানেন না।

মনিরুল হক এসে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ত্রিশ–বত্রিশ বছর বয়েসী ছেলে। এর মধ্যেই চুল পেকে গেছে। আজ বোধহয় সে ক্রমগাত পান খেয়ে যাচ্ছে — সবক'টা দাঁত লাল। এখনো মুখে পান আছে। এই গরমেও সে একটা হালকা গোলাপী রঙের স্যুয়েটার পরে আছে।

'স্যার আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ ডেকেছি। তোমার খবর কি মনিরুল ইসলাম?'

'জ্বি স্যার, আপনার দোয়া।'

'মুখভর্তি পান নিয়ে আর কখনো আমার ঘরে ঢুকবে না। পান ফেলে মুখ ধুয়ে তারপর আস।'

মনিরুল ইসলাম হকচকিয়ে গেল। ঘর ছেড়ে গেল। ঠিক তখন শুভ্র পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বের করে বলল, বাবা আসব? ইয়াজউদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কোত্থেকে?

শুভ্র হাসল।

'এসো, ভেতরে এসো।'

'তুমি কি খুব ব্যস্ত, বাবা? তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।'

'আমি কিছুটা ব্যস্ত, তবে চিন্তিত না। তুমি বস শুভ্র।'

শুভ্র বসল। ইয়াজুউদ্দিন সাহেব তাঁর পিএ-কে ডেকে বলে দিলেন কেউ যেন এখন না আসে। মনিরুল ইসলামকে এক ঘণ্টা পরে আসতে বললেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব পঞ্চম সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললেন, শুভ্র, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আজ সারাদিন কিছু খাওনি। তুমি পথে পথে ঘুরছ এবং তোমার মাথা ধরেছে।

'তোমার তিনটি ধারণাই সত্যি বাবা।'

'তুমি কি কিছু খাবে?'

'না।'

'কিছু বলার জন্যে এসেছ নিশ্চয়। বল।'

শুভ্র হাসিমুখে বলল, বাবা, তুমি তো জান আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে।

'জানি। তোমার সেই বন্ধুর নাম জাহেদ। সে একজন প্রফেশন্যাল প্রাইভেট টিউটর, তার স্ত্রীর নাম কেয়া। বিয়েতে তোমার বরযাত্রী হবার কথা ছিল। চশমা হারিয়ে ফেলার কারণে তুমি যেতে পারনি। এখন বল, কি বলবে — '

'বাবা, আমি ওদের দু'জনকে খুব সুন্দর একটা উপহার দিতে চাই।'

'অবশ্যই দেবে। তোমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমার কাছে দামী গিফট আশা করে।'

'আমি নতুন ধরনের কোন গিফট দেবার কথা ভাবছি। দামী কিছু না।

'যেমন?'

'জয়দেবপুরে আমাদের যে বাগানবাড়ি আছে আমি ভাবছি ঐ বাড়িতে তাদের আমি কয়েকদিন থাকতে বলব। ওরা খুব পছন্দ করবে, বাবা। এত সুন্দর বাড়ি। এত সুন্দর বাগান। জোছনা রাতে ঝিলে যে নৌকা আছে সেখানে ওরা চড়বে। আমার ভাবতেই ভাল লাগছে।'

'চা খাবে শুভ্র?'

'না।'

'তোমার মাথা ধরা কি সেরেছে?'

'এখন নেই।'

'একটু বস, আমি আমার নিজের জন্যে চায়ের কথা বলি। এই চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'বাবা, আমার বন্ধু বিয়ে করে খুব সমস্যার মধ্যে পড়েছে। আমাকে কিছু বলেনি তবু আমার অনুমান জাহেদ কেয়াকে নিয়ে কোথাও উঠতে পারছে না। জয়দেবপুরের বাড়িতে ওরা যদি থাকতে পারে তাহলে জীবনের শুরুটা ওদের অসম্ভব সুন্দর হবে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না, শুভ্র। আমার মনে হয়, ওরা যদি ঐ বাড়িতে ক'দিন থাকে তাহলে ওরা হতাশাগ্রস্ত হবে। ওদের জীবনের শুরু হবে ভুল দিয়ে। হুট করে বিয়ে করে ঐ ছেলে যে সমস্যা তৈরি করেছে — তোমার জয়দেবপুরের বাগানবাড়ি সেই সমস্যার কোন সমাধান নয়। তোমার বন্ধুর সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে।'

শুভ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যে কোন সুন্দর জিনিস কিন্তু আমরা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করি। একটা ভাল গান শুনলে আমরা সেই গান অন্যদের শোনাতে চাই। একটা ভাল বই পড়লে অন্যদের সেই বই পড়তে বলি। আমাদের এত সুন্দর একটা বাড়ি, সেই বাড়ি অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করলে কি ক্ষতি বাবা?

'সব জিনিস শেয়ার করা যায় না। আমি একটা **Crude** উদারহারণ দিয়ে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাই — মনে কর তুমি বিয়ে করলে। অসাধারণ একটি মেয়েকে বিয়ে করলে — যে মেয়ে তোমার কাছে মধুর সংগীতের মত। তুমি কিন্তু সেই মধুর সংগীত তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবে না। বাড়ির বেলাও

এই কথাটা সত্যি। বাড়ি হল খুবই ব্যক্তিগত সামগ্রীর একটি — নিজের পোশাকের মত। পোশাক যেমন তোমাকে ঢেকে রাখে, বাড়িও তোমাকে ঢেকে রাখে। তুমি কি আমার কথায় মন খারাপ করেছ?'

'হ্যাঁ, আমি সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম ওদের দু'জনকে কিছু বলব না। গাড়িতে করে জয়দেবপুরের বাড়িতে নামিয়ে রেখে বলব — আগামী এক সপ্তাহের জন্যে এই বাড়ি তোদের।'

'তুমি কি ওদের তুই করে বল?'

'জাহেদকে তুই করে বলি।'

'তোমার মুখে তুই শুনতে ভাল লাগে না, শুভ্র।'

'বাবা, আমি উঠি?'

'আচ্ছা যাও। আমার নিজেরও কিছু কাজ আছে। তোমার মা'কে বল, আমার ফিরতে রাত হবে। সে যেন কোথায় যেতে চাচ্ছিল — একাই যেতে বলবে।'

'আচ্ছা।'

'আর এই নিউজ উইকটা নিয়ে যাও। আর্টিফিসিয়েল ইন্টেলিজেন্স-এর উপর অসাধারণ একটা আর্টিকেল আছে। তোমার পড়তে ভাল লাগবে।'

শুভ্র হাত বাড়িয়ে নিউজ উইক নিল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বেল বাজিয়ে মনিরুল ইসলামকে আসতে বললেন। মনিরুল ইসলাম ঢুকল। তার চোখে-মুখে ভীত ভাব স্পষ্ট।

'বস মনিরুল।'

মনিরুল বসল। ইয়াজুদ্দিন ঘড়ি দেখলেন। এখনো হাতে সময় আছে। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। চিনি ছাড়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, এই প্রতিষ্ঠানে তোমার চাকরি কতদিন হয়েছে?

'স্যার, প্রায় ছ'বছর।'

'ছ'বছরে কি দেখলে?'

মনিরুল ঢোক গিলল। সে স্পষ্টতই ভয় পেয়েছে। ইয়াজুদ্দিন সাহেব বললেন, শোন মনিরুল, আমি যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন আমার সঙ্গে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানীর একটি এম.এসসি. ডিগ্রী এবং তিনশ' টাকা। আজ আমার সম্পদের পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। আমার লেগেছে ত্রিশ বছর। ত্রিশ বছরে এই অবস্থায় আসতে যে জিনিস লাগে তার নাম মস্তিষ্ক। শাদা রঙের থিকথিকে একটা বস্তু। ঠিক শাদাও না, অফ হোয়াইট। আমার মাথায় যে এই বস্তু প্রচুর পরিমাণে আছে তা কি তুমি জান, মনিরুল ইসলাম?

'জানি স্যার।'

'আজ তোমাদের কি পরিকল্পনা, কখন কি করবে আমি যে তার সবই জানি তা কি তুমি জান?'

মনিরুল চোখ নামিয়ে নিল। ঢোঁক গিলল।

'আন্দোলন করার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে। ঘেরাও করার অধিকারও হয়ত আছে। কিন্তু আগুন লাগিয়ে দেবার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না'

'আমি কিছু জানি না, স্যার।'

তুমি হয়ত জান না। কিন্তু আমি জানি। আমি খুব ভাল করে জানি। এ জাতীয় পরিস্থিতি কি করে সামাল দিতে হয় তাও জানি। আমাকে এইসব ঠেকে শিখতে হয়েছে। তুমি বাসাবোতে থাক না?

'জ্বি স্যার।'

'৩১ বাই এক, দক্ষিণ বাসাবো, দোতলা।'

'জ্বি স্যার।'

'দেখলে তোমাদের খোঁজ-খবর কত ভাল রাখি।'

'আপনি আমাকে কেন এইসব বলছেন, আমি স্যার কিছুই জানি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'স্যার, আমি সাতে-পাঁচে থাকি না। ওরা মিটিং করল — আমি বললাম . . . '

'মনিরুল ইসলাম,. তুমি এখন যাও।'

ইয়াজউদ্দিন ঘড়ি দেখলেন। তিনটা কুড়ি বাজে। অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক চারটায় ঘেরাও হবার আগে আগে পুলিশের সাহায্য চাইতে হবে। কোন করাণে তিনি যদি টেলিফোন করতে না পারেন তাহলে অন্য কেউ যেন কাজটা করে দেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

এরা কি এখানে বোমা-টোমা ফাটাবে? বোমা ব্যাপারটা সহজলভ্য হয়ে গেছে। নির্দোষ জর্দার কৌটায় ভরে ঘুরে বেড়ানো যায়। চারদিকে আতংক ছড়িয়ে দেবার জন্যে জর্দার কৌটাগুলির তুলনা হয় না। সময় কাটানোর জন্যে ইয়াজউদ্দিন সাহেব শুভ্রের ফাইল ড্রয়ার থেকে বের করলেন। কাজটা তিনি নজুবুল্লাহকে দিয়েছিলেন। সাতদিনের রিপোর্ট দেবার কথা ছিল।

প্রতিদিন একহাজার টাকা হিসেবে সাতদিনের জন্যে সাতহাজার। লোকটা আনাড়ি ধরনের কাজ করেছে। মাঝে মাঝে অতি চালাকি করতে গিয়ে ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণে চলে গেছে। এটা করেছে ফাইল মোটা করার জন্যে। ইয়াজউদ্দিন চোখ বুলাতে লাগলেন।

সোমবার

১৩ই নভেম্বর ১৯৯২।

শুভ্র সাহেব বাড়ি থেকে বের হলেন দশটা একুশ মিনিটে। গেটের কাছে এসে দারোয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। তিনি বাড়ির বাইরের বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আবার বের হলেন এগারোটা বাজার দু'মিনিট আগে। তার পরনে ছিল কালো প্যান্ট, শাদা শার্ট। পায়ে স্যান্ডেল।"

পড়তে পড়তে ইয়াজউদ্দিনের ভ্রু কুঞ্চিত হল। শুভ্র কি পরে ঘর থেকে বের হয়েছে তার এত বিতং করে লিখতে তাকে কে বলেছে?

শুভ্র সাহেব রিকশা নিলেন রাস্তার মোড়ে এসে। রিকশার নম্বর — ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি ৭১১। তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের কাছে এসে রিকশা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে — অন্য একটা রিকশা নিলেন। এই রিকশার নম্বর — ঢাকা মিউনিসিপ্যালটি ২০০৩। এইবার তিনি রিকশার হুড ফেললেন না। তবে রিকশা হাইকোর্টের কাছাকাছি যাবার পর তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। পুলিশকে টেলিফোন করার সময় হয়ে গেছে।

৭

মিজান সাহেব বেশ স্বাভাবিক আছেন। তিনি নাপিতের দোকান থেকে চুল কাটিয়েছেন। একেবারে কদমছাট। মাথাটা কালো রঙের কদম ফুলের মতই দেখাচ্ছে। চুল কাটার জন্যেই তাঁকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। এ ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কথাবার্তা, চালচলন খুব স্বাভাবিক। হঠাৎ হঠাৎ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দু'-একটা কুৎসিত বাক্য বলে আবার স্বাভাবিক হয়ে যান। যেমন, আজ দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় সহজভাবে ভাত খাচ্ছিলেন, হঠাৎ মনোয়ারার দিক তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, মাগী, তুই তরকারিতে লবণ দেস না কেন? আমার কি লবণ কেনার পয়সাও নাই? মানোয়ারা কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কাঁদলেন না। কাঁদলে আবার কোন বিপত্তি ঘটে। তিনি ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লবণ নিয়ে এলেন। ততক্ষণে মিজান সাহেব স্বাভাবিক। তিনি কোমল গলায় বললেন, মনু, তুমি একসঙ্গে খেয়ে ফেল না কেন? একসঙ্গে খেয়ে ফেললে ঝামেলা কমে। কাজের লোক একটা রাখতে হবে। কাজের লোক ছাড়া সংসার চালানো সম্ভব না। তুমি একা ক'দিক দেখবে?

সৌভাগ্যের সংবাদ বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতে হয়। দুর্ভাগ্যের সংবাদ দিতে হয় না। সবাই জেনে যায়। ঢাকায় মিজান সাহেবের সব আত্মীয়স্বজনই খবর পেয়ে গেছেন। তাঁরা দেখতে আসছেন। পাগল দেখা এবং পাগলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার এক আলাদা মজা। মিজান সাহেব সবাইকেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলেন। কোন রকম পাগলামি দেখালেন না। সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বললেন, হাসলেন।

জাহেদ সন্ধ্যবেলা মামাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার মিজান সাহেবের অফিসের এক কলিগের ভায়রা ভাই। সেই কলিগই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্যে খুব ভাল ডাক্তার। অর্ধেক ফি-তে তিনি রোগী দেখে দেবেন। অর্ধেক ফি-তে যে সব রোগী দেখা হয় তাদের পেছনে ডাক্তাররা অর্ধেকেরও কম সময় ব্যয় করেন। উপসর্গ শোনার আগেই ব্যবস্থাপত্র লেখা হয়ে যায়। তবে এই ডাক্তার অনেক সময় ব্যয় করলেন। নানান ধরনের প্রশ্ন-টশ্ন করে বললেন, আমি তো কিছু পাচ্ছি না। আমার মনে হয় আপনারা অকারণে বেশি দুঃশ্চিন্তা করছেন। উনার মূল সমস্যা কি?

জাহেদ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, হঠাৎ রেগে যান। মামীর সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেন। গালাগালি করেন।

স্ত্রীর প্রতি মাঝে মাঝে রেগে যাওয়া কি খুব অস্বাভাবিক? আমরা সবাই কখনো কখনো রাগি।

জাহেদ বলল, কিন্তু উনার মনে থাকে না যে উনি রেগেছেন। তাছাড়া মামা আগে কথা প্রায় বলতেন না, এখন প্রচুর কথা বলেন। সারাক্ষণই কথা বলেন।

'উনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন?'

'জ্বি বলেন। রাত জেগে গল্প করেন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, আমার ধারণা, এক ধরনের নার্ভাস শকের ভেতর দিয়ে উনি গেছেন। স্নায়ুর উপর দিয়ে বড় ধরনের কোন ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের কারণে স্নায়ুর তন্ত্রীতে এক ধরনের ধাক্কা লেগেছে। সাময়িক বিকল অবস্থা যাচ্ছে। এটা কিছুই না। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ঘুমুতে হবে। সবচে' ভাল হয় যদি স্থান পরিবর্তন করা যায়। আপনি বরং আপনার মামাকে নিয়ে কোথাও যান, ঘুরে-টুরে আসুন।

কথাবার্তা মিজান সাহেবের সামনেই হচ্ছে। তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। ডাক্তার সাহেব থামতেই বললেন, এটা মন্দ বুদ্ধি না। জাহেদ, চল গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। টাটকা-টাটকা খেজুরের রস খেয়ে আসি। অনেকদিন খেজুরের রস খাওয়া হয় না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, ভাল বুদ্ধি। যান, গ্রাম থেকে ঘুরে আসুন।

জাহেদ তার মামাকে নিয়ে বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এল। ডাক্তার সাহেব লম্বা প্রেসক্রিপ্শন করেছেন। নানান ধরনের ভিটামিন, হজমের অষুধ, ঘুমের অষুধ। তিনশ' টাকা চলে গেল অষুধে। মিজান সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, অষুধে কোন কাজ হবে না। আমার দরকার গ্রামের খোলা হাওয়া। রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস আছে। চল বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে চলে যাই। ট্রেনেও অনেকদিন চড়া হয় না। ভালই হল। আজ লজ্জা ভেঙ্গেই যাবে।

মামাকে বাসায় রেখে জাহেদ গেল কেয়ার সঙ্গে দেখা করতে। পুরো দু'দিন চলে গেছে কেয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি। গতকাল একবার এসেছিল। লজ্জায় সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে পারেনি।

জালিল সাহেব দরজা খুলে দিয়ে হাসিমুখে বললেন, আরে দুলামিয়া যে! হা হা

হা। আসুন, আসুন। আপনি আসবেন বুঝতে পারছিলাম।

জাহেদ শুকনো গলায় বলল, কেমন আছেন?

'আলহামদুলিল্লাহ (ভাল আছি। আপনার ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? বিয়ে করে বৌ ফেলে চলে গেলেন। নো পাত্তা। ব্যাপারটা কি? আমার আটত্রিশ বছরের জীবনে এমন ঘটনা শুনি নি।'

জাহেদ বলল, কেয়া আছে?

'আছে, আছে — যাবে কোথায়? ঘরেই আছে। জ্বর হয়েছে শুনেছি। আমি ঠাট্টা করে বলেছি — বিরহ জ্বর। হা হা হা।'

'কেয়াকে একটু খবর দেবেন?'

: 'আরে কি মুশকিল! আমি খবর দেব কেন? আপনি হলেন এ বাড়ির জামাই। আপনি সুরসুর করে ভেতরে ঢুকে যান। আমি কে? আমি হলাম আউটসাইডার।'

জাহেদকে ভেতরে ঢুকতে হল না। কেয়া বের হয়ে এল। তার গায়েজ্বর। একশ' দুইয়ের কাছাকাছি। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু সে বেশ স্বাভাবিক। জাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসল। নরম গলায় বলল, চল ছাদে যাই।

জলিল সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, আরে না, ছাদে যাবে কেন? জ্বর নিয়ে ছাদে যাবার কোন দরকার নেই। গল্প-গুজব যা করার এখানে বসেই কর। স্বামী-স্ত্রীর গল্প বলার তো কিছু নাই। হা হা হা।

কেয়া কিছুই বলল না। দরজা খুলে রওনা হল। তার গায়ে পাতলা একটা চাদর। চাদরে বোধহয় শীত মানছে না। সে অল্প অল্প কাঁপছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে ধরল। জাহেদ তাকে ধরে ফেলল। জাহেদ বলল, শরীর এত খারাপ করেছে কি ভাবে? কেয়া বলল, বুঝতে পারছি না। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করেছি। মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

'কাশি আছে?'

'আছে। শুনতে চাও?'

কেয়া হাসছে। জাহেদ বলল, ছাদের হাওয়ায় বসা বোধহয় ঠিক হবে না।

'ঠিকই হবে। চুপ করে বস। তোমার মামা কেমন আছেন?'

'বুঝতে পারছি না। খুব ভাল মনে হচ্ছে না। মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে কিংবা হতে যাচ্ছে।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'হুঁ।'

'ডাক্তার কি বললেন?'

'অষুধপত্র দিয়েছেন। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছেন। পরিবেশ বদলাতে বললেন।'

'নিয়ে যাচ্ছ গ্রামের বাড়িতে?'

'হুঁ।'

'কবে?'

'আজ রাতের ট্রেনেই যেতে চাচ্ছেন। এখনো বুঝতে পারছি না।'

'নিয়ে যাও।'

'নিয়ে যেতে বলছ!'

'হুঁ বলছি। তোমার নিজের উপর দিয়েও মনে হয় ঝড় যাচ্ছে। তোমারও চেঞ্জ দরকার। নয়ত পরে দেখা যাবে মামা যে পথে যাচ্ছে — ভাগ্নেও সেই পথে যাচ্ছে। দু'জনই আইল্যান্ডে নেংটো হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কনট্রোল করছে।'

কেয়া হাসছে। কি সুন্দর লাগছে কেয়াকে! জাহেদ মনে মনে বলল, আমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। কি চমৎকার একটি তরুণীকে আমি পাশে পেয়েছি।

কেয়া বলল, গম্ভীর হয়ে আছ কেন? আমার কথায় রাগ করেছ?

'না, রাগ করব কেন?'

'আজ শেভ করনি কেন?'

'তাড়াহুড়ায় সময় পাইনি।'

কেয়া নিচু গলায় বলল — বাসর রাতে তোমাকে বলার জন্যে সুন্দর একটা গল্প রেডি করে রেখেছিলাম। মনে হচ্ছে বাসর হতে অনেক দেরি। গল্পটা এখন বলব?

'না, থাক। এখন শুনব না।'

'তোমাকে যে নীল একটা হাফশার্ট আর ধবধবে শাদা প্যান্ট কিনতে বলেছিলাম, কিনেছ?'

'না।'

'নেক্সট টাইম যখন আসবে শাদা প্যান্ট এবং নীল শার্ট যেন গায়ে থাকে।'

'আচ্ছা থাকবে।'

জাহেদ বলল, আমি বরং আজ যাই। মামাকে যদি দেশে নিয়ে যেতে হয় তাহলে গোছগাছ করতে হবে।

'আচ্ছা যাও।'

'তুমিও নিচে চল। জ্বর নিয়ে ছাদে বসে থাকবে না।'

'কেয়া বলল, আমি আরো কিছুক্ষণ থাকব। তুমি যাও।'

'ঠাণ্ডা লাগবে তো!'

'লাগুক। কালও অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে ছিলাম।'

'কেন?'

কেয়া ক্লান্ত গলায় বলল, কি করব বল। কিছু ভাল লাগছে না। কাল ছাদে বসে কি ভাবছিলাম জান? ভাবছিলাম যদি আমাদের কখনো একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয় তাহলে পুরো এক রাত এবং একদিন তোমাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকব। একটা সেকেন্ডের জন্যেও তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।'

জাহেদ বলল, কয়েকটা দিনের ব্যাপার। আমি একটা ফ্ল্যাটের জন্যে সবাইকে বলেছি। দু'রুমের ফ্ল্যাট।

'ফ্ল্যাটের ভাড়া কিভাবে দেবে?'

'একটা ব্যবস্থা হবেই। যাই কেয়া।'

'আচ্ছা।'

আচ্ছা বলেও জাহেদ গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। কেয়া বলল, কিছু বলবে?

'বাসায় তোমার আপাকে কি বলেছ?'

'বলেছি একটা কিছু তোমার শোনার দরকার নেই।'

'কি যে বিপদে পড়েছি কেয়া।'

'কোন বিপদ না। তুমি চলে যাও।'

জাহেদ চলে গেল। কেয়া বসে আছে চুপচাপ। বাতাসে তার মাথার চুল উড়ছে।

৮

শুভ্র সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমালো। রেহানা কয়েকবার খোঁজ নিয়ে গেলেন। এতক্ষণ তো শুভ্র ঘুমায় না। জ্বর-টর হয়নি তো? তিনি একবার কপালে হাত দিলেন। গা গরম লাগছে। সারাদিন রোদে রোদে ঘুরলে জ্বর তো আসবেই। সন্ধ্যায় রেহানা শুভ্রকে ডেকে তুললেন। সন্ধ্যাবেলা ঘুমুতে নেই। সন্ধ্যায় ঘুমুলে আয়ু কমে যায়।

'শুভ্র, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে, বাবা?'

'না।'

'গা গরম।'

'আমার গা ঠিকই আছে মা, তোমার হাত ঠাণ্ডা।'

'মুখ ধুয়ে আয়। চা দিয়েছি।'

'আমি আরো খানিকক্ষণ ঘুমুব, মা।'

'কি পাগলের মত কথা বলছিস? তোর রিয়া খালার বাড়ি যাবি না?'

'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না, মা।'

'কথা বাড়াবি না। উঠে আয়। রিয়া গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। উঠ্ তো বাবা। এই নে তোর চশমা।'

শুভ্র উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে চশমা নিল। রেহানা বললেন, তোর সব কাপড় ইস্ত্রি করে রাখা আছে। পায়জামা পাঞ্জাবী। রিয়া বলেছে তোকে যেন পায়জামা পাঞ্জাবী পরানো হয়।

'মা, আজ না গিয়ে অন্য একদিন যাব।'

'খানিকক্ষণ থেকে চলে আসবি। রিয়ার না-কি তোর সঙ্গে কি কথা আছে।'

'পার্টি-ফার্টি না তো মা?'

'উঁহু, পার্টি না। পার্টি হলে রিয়া বলতো। হাত ধর্ শুভ্র। আমার হাত ধরে বিছানা থেকে নাম।'

শুভ্র মা'র হাত ধরে বিছানা থেকে নামল।

রিয়াদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে ঢুকে শুভ্রের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত আলো চারদিকে ঝলমল করছে! শুধু যে আলো তাই না, খুব হৈচৈও হচ্ছে। ড্রয়িংরুমটা

অনেক বড়, তারপরেও মনে হচ্ছে লোকজন গিজ গিজ করছে। উঁচু ভল্যুমে সিডি বাজছে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই সিডি প্লেয়ার বাজতে থাকে।

শুভ্রকে ঢুকতে দেখে রিয়া ছুটে এল। রিয়ার হাতে কাঁচের মাছ আকৃতির প্লেট। প্লেটভর্তি টুথপিকের মাথায় বসানো বিচিত্র কোন খাবার। পার্টি হলেই রিয়া কোন একটি বিচিত্র খাবার নিজে তৈরি করে। আজকের এই খাবারটি তার তৈরি। অতিথিরা কেউ এই খাবারে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অতিরিক্ত লবণের জন্যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না।

রিয়া বলল, আয় শুভ্র।

শুভ্র আতংকিত গলায় বলল, পার্টি না কি?

'আরে না। পার্টি কোথায় দেখলি। কয়েকজনকে শুধু খেতে বলেছি। হা কর দেখি, মুখে একটা খাবার দিয়ে দি। সল্টেড ড্রাই বীফ। মেক্সিকান খাবার। হান্টার বীফকে লবণে জেরে বানাতে হয়।

'ছোট খালা, তুমি আমার কাছে দাও। নিজে খাচ্ছি, খাইয়ে দিতে হবে না।'

'মুখে তুলে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। দেখি হা কর। আর শোন, সবার সামনে আমাকে খালা ডাকবি না। আমি অনেক দূরের খালা — লতায়-পাতায় খালা। তোর চে' মাত্র দু'বছরের বড়।'

'কি ডাকব?'

'নাম ধরে ডাকবি। মিষ্টি করে বলবি — রিয়া। কই হা কর।'

শুভ্র হা করল। সবাই তাকাচ্ছে তার দিকে। খুব অস্বস্তি লাগছে। কে যেন একটা কি রসিকতা করল। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। রিয়া বলল, আমাকে কেমন লাগছে?

'ভাল।'

'ঠিকমত তাকিয়ে তারপর বল — ভাল। চশমার ভেতর দিয়ে ভাল করে দেখ।'

'খালা, আমি এই ঘরে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'এ ঘরে তোকে বেশিক্ষণ বসতে হবে না। তোকে অন্যঘরে নিয়ে যাচ্ছি — একটি মেয়ের সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দেব। ওর সঙ্গে কথা-টথা বলে দেখ মনে ধরে কি-না। এক বছরের জন্যে তোকে না-কি বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটাকে যদি মনে ধরে ওকে নিয়ে যা। তার আগে আয় তোকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

রিয়া শুভ্রের হাত ধরে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। রিয়া উঁচু গলায় বলল,

এটেনশান প্লীজ। আমি এই পৃথিবীর সবচে' রূপবান ছেলেটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এই ছেলে আমাকে খালা ডাকে — যদিও আমি তার খালা নই। এই ছেলে তার জীবনে কোন পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। কোন পরীক্ষায় সেকেন্ড হলে কেমন লাগে সে অভিজ্ঞতা এই ছেলের নেই। এর নাম শুভ্র . . .

রিয়ার কথা শেষ হবার আগেই মোটামত এক ভদ্রলোক বললেন, শুভ্র ভাই, এদিকে আসুন, আপনার পায়ের ধুলা দিয়ে যান। আমরা কপালে মাখি।

সবাই আবারো হো হো করে হেসে উঠল। রিয়া বলল, ফরিদ সাহেব, শুভ্রকে নিয়ে হাসি–তামাশা করবেন না। ও খুবই সেনসিটিভ। ছোটবেলায় কেউ ওকে কিছু বললে দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদত। এখনো হয়ত এরকম করে। শুভ্র, তুই কি এখনো কাঁদিস?

শুভ্র বলল, এখন কাঁদি না — এখন হাসি।

'শুভ্র, তাহলে হাসতে হাসতে পাশের ঘরে চলে যা। ঐ ঘরে তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে। ডিনার রাত দশটার আগে দেয়া হবে না। ঘরে কোন রান্না হয়নি – – খাবার বাইরে থেকে আসবে।'

ফরিদ আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম। আমরা হান্টার বীফ খেয়ে আতংকের মধ্যে ছিলাম।

সবাই আবারো হাসল। রিয়ার মুখ হাসি–হাসি। পার্টি জমে গেছে। এক একবার এমন হয় — পার্টি জমতে চায় না। হৈচৈ হয়, খাওয়া–দাওয়া সবই হয়, তারপরেও পার্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। পার্টি শেষ হলে খুব ক্লান্ত লাগে। আবার কোন কোন দিন হুট করে পার্টি জমে যায়। কেউ পর্টি ছেড়ে উঠতে চায় না। সামান্যতেই সবাই হেসে গড়াগড়ি করে। রিয়া আজ মনে–প্রাণে চাচ্ছে পার্টি জমে উঠুক। খুব ভাল করে জমুক। রাত একটা বেজে যাবে। কেউ বুঝতেও পারবে না এত রাত হয়েছে —। কেউ আগে আগে চলে যেতে চাইবে না। কেউ বলবে না — 'সরি, বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমার জরুরি কাজ আছে। আমাকে বিদায় দিতে হবে। খুব এনজয় করেছি।' রিয়াকেই বলতে হবে — এটেনশান প্লীজ, দয়া করে আপনারা গাত্রোত্থান করুন। রাত একটা বেজে গেছে। তবে যাবার আগে একটি গুড নিউজ শুনে যান। গুড নিউজটি শুভ্র প্রসঙ্গে . . .

হ্যাঁ, রিয়া বিদেশী গল্প–উপন্যাসের মত ব্যাপারটা করতে চায়। পার্টিতে এনগেজমেন্ট ডিক্লারেশন করার মত ঘটনা ঘটাতে চায়। ইয়াজউদ্দিন সাহেব রিয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। মেয়েটি সম্পর্কে আসল জায়গা থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া

গেছে। শুভ্র কি করবে না করবে তা নির্ভর করছে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের উপর। শুভ্রের উপর না। তবে ইয়াজউদ্দিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। শুভ্রকে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে দেবেন না। শুভ্র জানে না যে তার বাবা মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছেন। মেয়েটির পরিবার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হয়েছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের কথামতই আজকে এই পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বাইরে থেকে যে খাবার আসার কথা তার ব্যবস্থাও ইয়াজউদ্দিন সাহেবের করা।

রিয়া শুভ্রকে ড্রয়িংরুমের লাগোয়া একটা ঘরে নিয়ে গেল। ছেলেমানুষি খুশি-খুশি গলায় বলল, শুভ্র, সোফায় যে তরুণীটি বসে আছে তুই তার সঙ্গে কথা-টথা বল। তাকে আনা হয়েছে তোকে কোম্পানী দেয়ার জন্যে। পার্টি তুই সহ্য করতে পারিসনা, আমি জানি — তোর জন্যে এক্সক্লুসিভ ব্যবস্থা। আমার মেলা কাজ, আমি যাচ্ছি —। এক ফাঁকে এসে তোদের কফি দিয়ে যাব।

রিয়া ঝড়ের মত বের হয়ে গেল। মেয়েটি সহজ গলায় বলল, বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন। আমার নাম আনুশকা। ডাক নাম নীতু।

শুভ্র অবাক হয়ে বলল, আশ্চর্য ! আপনার নাম নীতু !

নীতু বিস্মিত হয়ে বলল, এত অবাক হচ্ছেন কেন? নীতু নামটা কি আপনার কাছে খুব অপরিচিত লাগছে?

'না, অপরিচিত লাগছে না। আমার এক পরিচিত মেয়ের নাম নীতু। আমি আমার জীবনে এত ভাল মেয়ে দেখিনি।'

'ভাল মেয়ে বলতে কি বুঝাচ্ছেন? ভাল ছাত্রী?'

'সবকিছু নিয়েই ভাল। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে গেলে মনে পবিত্র ভাব হয় । নীতু আপা তাদের মধ্যে একজন।'

'উনি আপনার আপা হন?'

'জ্বি। আমার বন্ধুর বড় বোন।'

'আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন, বসে বসে আপনার নীতু আপার গল্প করুন।'

শুভ্র বসল। সে হঠাৎ লক্ষ্য করল আনুশকার সঙ্গে গল্প করতে তার ভাল লাগছে। ভাল লাগার অনেক কারণের মধ্যে একটি হয়ত এই যে মেয়েটি খুব আগ্রহ নিয়ে শুভ্রের গল্প শুনছে।

রিয়া এক ফাঁকে এসে দু'জনের হাতে দু'গ্লাস কোক ধরিয়ে দিয়ে কানে কানে শুভ্রকে বলল, মেয়েটা দারুণ না? পছন্দ হচ্ছে?

শুভ্র হাসল। রিয়া বলল, ভাল কথা, খুব ভাল এক বোতল শ্যাম্পেন আছে।

বোতলটা নিউ ইয়ার্স ডেতে খোলা হবে ভেবেছিলাম — তোর খালু খুলে ফেলেছে। শুভ্র, তুই কি এক চুমুক খেয়ে দেখবি?

'না।'

'আচ্ছা বাবা, যা খেতে হবে না। তুই নীতুর সঙ্গে গল্প কর। গল্প করতে করতে যদি তোর ইচ্ছা করে নীতুর হাত ধরতে — ধরতে পারিস। নীতু কিছুই মনে করবে না। তাই না নীতু?'

নীতু হাসতে হাসতে বলল, আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু শুভ্র কখনোই আমার হাত ধরতে চাইবে না।

রিয়া বলল, কে বলেছে চাইবে না? খুব চাইবে।

'উঁহু। পুরুষ মানুষ আমি খুব ভাল চিনি। ওরা তাদের নিজেদের যতটা চেনে আমি তারচেয়েও বেশি চিনি। শুভ্র সাহেব নীতু নামের একজনের হাত ঠিকই ধরতে চাচ্ছেন, সেই একজন আমি নই।'

শুভ্র অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। আশ্চর্য! মেয়েটি ঠিক কথাই বলেছে। এই নীতুর দিকে তাকিয়ে সে নীতু আপার কথাই ভাবছিল। কি আশ্চর্য কথা! তার হাত থেকে ছলকে খানিকটা কোক সাদা পাঞ্জাবীতে পড়ে গেল। নীতু শব্দ করে হেসে উঠল।

৯

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

মাহিন সাহেব কান্নার শব্দ শুনছেন। সব শব্দ তাঁর চেনা। এই কান্নার শব্দ অপরিচিত। অবশ্যি তিনি জানেন কে কাঁদছে। এ বাসায় তিনি ছাড়া আর একজন মানুষই বাস করে — নীতু। নীতুই কাঁদছে। নীতু ছাড়া আর কে হবে? কিন্তু এরকমভাবে কাঁদছে কেন? মাহিন সাহেব ডাকলেন, নীতু! নীতু!

নীতু দরজা ধরে দাঁড়াল। মাহিন সাহেব বললেন, কি করছিলি?

'রুটি বানাচ্ছিলাম। তুমি রুটি খাবে রাতে।'

'কাঁদছিলি নাকি?'

'না, কাঁদছিলাম না। কথায় কথায় আমি কাঁদি না। তাছাড়া কাঁদার মত কিছু হয়ওনি।'

'আমি ভুল শুনলাম?'

'হ্যাঁ, তুমি ভুল শুনেছ। অনেক দিন থেকেই তুমি ভুল চিন্তা করছিলে। এখন তুমি ভুল শোনাও শুরু করেছ।'

'আয় আমার কাছে। বোস।'

'আমার রুটি বানাতে হবে, বাবা।'

'রুটি পরে বানালেও হবে। না বানালেও অসুবিধা নেই। রাতে আমি কিছু খাব না। তুই আমার কাছে এসে বোস।'

নীতু বাবার কাছে বসল। মাহিন সাহেব বললেন, মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে তোর মাথায় হাত রেখে আদর করি। ইচ্ছা করলেও পারি না। মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আমার সেই অধিকার হরণ করেছেন।

নীতু বলল, তুমি কি কোন দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছ, বাবা? দীর্ঘ বক্তৃতা শোনার ইচ্ছা আমার নেই। ছোটবেলা থেকে তোমার দীর্ঘ বক্তৃতা এত শুনেছি যে বক্তৃতা ব্যাপারটা থেকে আমার মন উঠে গেছে।

'তাও আমি জানি। বক্তৃতা দেয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি আমার সব কথা শুভ্র'র জন্যে জমা করে রাখি। সে এলে তাকে বলি।'

'ভাল। কথা শোনাবার একজন কেউ আছে।'

'তোর নেই?'

'না, আমার নেই। আমার কথা শোনাবার কেউ নেই।'

মাহিন সাহেব গলার স্বর তীক্ষ্ণ করে বললেন, যে ছেলেটিকে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস সে তোর কথা শুনে না?'

'তাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। সবাইকে সবকিছু বলা যায় না। আমি এখন যাই — তোমার খাবার রেডি করি।'

'কিছু রেডি করতে হবে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু খাব না।'

'সিদ্ধান্ত কখন নিলে?'

'গতকাল নিয়েছি। আজ তা কার্যকর করতে যাচ্ছি।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে তুমি খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমার পক্ষে একা একা বাস করা সম্ভব না। আমি একজন পরজীবী। রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবনযাপন করব তাও সম্ভব না। অবাস্তব পরিকল্পনা।'

'না খেয়ে থাকার পরিকল্পনা বাস্তব?'

'এটি অবাস্তব, তবে আমি কোন বিকল্প পাচ্ছি না।'

'না খেয়ে না খেয়ে তুমি মারা যাবে এটিই কি তোমার পরিকল্পনা?'

'হ্যাঁ। তবে মৌলিক পরিকল্পনা না। আমার আগেও একজন তা করে গেছেন। তাঁর নাম লিয়াওসিন — চৈনিক কবি। তিনি অবশ্যি করে গেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তিনি মৃত্যু কি, মৃত্যু কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে তা জানার জন্য উপবাস শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকেন। তুই কি শুনতে চাস তাঁর অভিজ্ঞতার কথা?'

'না।'

'তোর শুনতে ভাল লাগবে। মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাবার সময় তিনি বেশকিছু ত্রিপদী কাব্য রচনা করেন। তার আক্ষরিক অনুবাদ ইংরেজিতে করা হয়েছে। ইংরেজি থেকে আমি কিছু কিছু বাংলা করেছিলাম। শুনবি?'

'না, শুনব না।'

'আচ্ছা একটা শোন —

> "দিন হল রাত্রি, এবং রাত্রি হল দিন
> মাথার ভেতর উঠল বেজে এক সহস্র বীণ।"

নীতু উঠে চলে গেল। মাহিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনায় মোটামুটি স্থির । খাওয়া বন্ধ। এই ভাবেই তিনি এখন মৃত্যুর দিকে এগুবেন। সবাইকে মুক্তি দিয়ে যাবেন। কাউকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা এখন তাঁর নেই কিন্তু মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই আছে। আবারো কান্নার শব্দ শুনছেন। রান্নাঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। নীতুই কাঁদছে।

'নীতু! নীতু!'

নীতু ঘরে ঢুকল না। রান্নাঘর থেকেই বলল, কি?

'তুই কি শুভ্রকে একটু খবর দিতে পারবি? ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।'

'খবর দেব।'

'আজ খবর দিবি?'

'হ্যাঁ, আজই দেব।'

'তোর মা'কে খবর দিতে পারবি? তোর মা'র সঙ্গেও আমার কথা বলা দরকার।'

'মা'কে খবর দেয়া যাবে না। মা ঢাকায় নেই। রাজশাহী গিয়েছেন। ছোট খালার মেয়ের বিয়ে।'

'যাবার সময় আমাকে কিছু বলেও যায় নি!'

'আমাকে বলে গেছে। আমি তোমাকে বললাম।'

মাহিন সাহেব করুণ গলায় বললেন, কয়েক মিনিটের জন্যে তুই কি আমার পাশে বসবি?

নীতু কিছু না বলেই বাবার পাশে বসল। মাহিন সাহেব বললেন, তোর মা আমার ছাত্রীই ছিল। জানিস তো?

'জানি। তোমাকে বিয়ে করার পর মা'র আর পড়াশোনা হয় নি — তাও জানি। তুমি কি বলবে বল — আমি শুনে চলে যাব। আমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

'থাক। কিছু বলব না।'

'তুমি যা বলতে চাচ্ছ তা অনুমান করতে পারছি। তুমি বলতে চাচ্ছ, এক সময় তোমার ছাত্রী তোমার প্রেমে পাগল হয়েছিল — ঘুমের অষুধ পর্যন্ত খেয়েছিল — আজ সে রাজশাহী চলে গেল, তুমি কিছু জানলেও না। এটা বলার মত কোন ঘটনা না, বাবা। তুমি এক সময় উদাহরণ দিয়েছিলে — মৃগনাভির গন্ধও এক সময় শেষ হয়ে যায়। পড়ে থাকে এক খণ্ড পচা মাংসপিণ্ড।'

মাহিন বললেন, আচ্ছা তুই যা। নীতু উঠে চলে গেল। মাহিন সাহেব আবার ডাকলেন, নীতু! নীতু!

নীতু এসে দাঁড়াল। মাহিন সাহেব বললেন, একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে দিয়ে দিবি? নীতু বলল, না। ঘরে সিগারেট নেই। থাকলেও দিতাম না।

'তোকে দেখে এখন একটা কবিতা মনে পড়ছে — শুনবি? কোলরিজের কবিতা। বলব কয়েক লাইন?'

'বল।'

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky ;
So was it when my life began,
So is it now I am a man,
So be it when I shall grow old,
Or let me die!

নীতু বলল, এটা কোলরিজের কবিতা না, বাবা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা। খুব কম করে হলেও দশ হাজার বার তুমি এই কবিতা আমাদের শুনিয়েছ। তোমার স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে, বাবা।

মাহিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ঠিক বলেছিস। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পরজীবী প্রাণীর স্মৃতিশক্তির অবশ্যি তেমন প্রয়োজন নেই। তুই শুভ্রকে টেলিফোন করিস মনে করে।

'করব।'

'আজই করবি। অফিসে গিয়েই করবি।'

'আচ্ছা।'

শুভ্রদের বাসার সামনে ছোটখাট একটা ভীড়। কালোমত রোগা একজন তরুণী কাঁদছে। তরুণীর সঙ্গে দু'টি মেয়ে। এদের বয়স ছ'-সাত। এরা কাঁদছে না। তবে এদের দৃষ্টি ভয়ার্ত। মেয়ে দু'টি মনিরুল ইসলামের কন্যা। তরুণী মেয়ে দু'টির মা। তারা গত তিনদিন যাবৎ মনিরুল ইসলামের কোন খোঁজ পাচ্ছে না। মানুষটা যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। সকাল থেকে এরা 'কান্তা ভিলা'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 'কান্তা-ভিলা'র গেট খোলা হচ্ছে না। যে কোন তরুণীকে কাঁদতে দেখলেই লোক জমে যায়। তরুণী রূপসী হলে তো কথাই নেই। লোক জমে গেছে। অভিজাত এলাকা বলেই ভীড় তত বেশি হয়নি। মনিরুল ইসলামের স্ত্রী একটা জিনিসই চায়। তা হল — বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে। বড় সাহেবের সঙ্গে দু'টা কথা বলে চলে যাবে।

ইয়াজউদ্দিন খবর পেয়েছেন। তিনি ব্যাপারটায় কিছুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

গুরুত্ব দেয়ার মত কোন বিষয় এটা নয়। তা ছাড়া বাড়িতে তিনি তাঁর অফিসের কিংবা কারখানার কোন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি গোমেজকে দিয়ে খবর পাঠালেন মেয়েটি যেন তাঁর অফিসে ঠিক বারোটার সময় দেখা করে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব আজ অফিসে দেরি করে যাবেন। শুভ্র'র চোখ দেখাতে হবে। চোখের ডাক্তাররা সাধারণত বিকেলে বসেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেবের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। ডাক্তার সাহেব শুভ্রকে দেখবেন সকাল বেলা। তিনি শুভ্রকে নিয়ে যাবেন। রেহানা যাবেন না। কারণ ডাক্তার কি বলবেন বা বলবেন না ভেবে তাঁর খুব টেনশান হয় ।

চোখের ডাক্তার প্রফেসর মনজুরে এলাহী শুভ্র'র দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, কি খবর আমাদের শুভ্র বাবুর?

মনজুরে এলাহী শুভ্র'র চোখ ওর এগারো বছর বয়স থেকে দেখে আসছেন। তখনো তিনি শুভ্র বাবু ডাকতেন — এখনো ডাকেন।

শুভ্র বলল, চাচা, আমি ভাল আছি।

'তোমার চোখ কেমন আছে?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় ভালই আছে।'

'কোন রকম সমস্যা হয়?'

'না।'

'হঠাৎ আলো বেড়ে যায় বা কমে যায়, এমন কি হয়?'

'হ্যাঁ হয়।'

'আচ্ছা বস দেখি এই চেয়ারে। রিলাক্সড হয়ে বস। চশমা খুলে ফেল। আমি এখন তোমার চোখে নানান রঙের আলো ফেলব। তুমি রঙগুলি বলার চেষ্টা করবে।'

'আচ্ছা।'

'কোন আলো ফেললে যদি এমন হয় যে চিনচিনে ব্যথা বোধ করছ বা অস্বস্তি বোধ করছ, তাও বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আলো ফেল্যার পর্ব অনেকক্ষণ চলল। ডাক্তার সাহেব বললেন, শুভ্র, এখন আমি তোমার দু'চোখে দু'ফোটা অষুধ দেব। এট্রোপিন ড্রপ। এটা একধরনের এলকালয়েড। এই অষুধ তোমার চোখের মণি ডাইলেট করে দেবে।

শুভ্র বলল, আপনার যা ইচ্ছা করুন ডাক্তার চাচা। আমাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। শুধু পরীক্ষা শেষ হবার পর বলবেন — আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি কি যাচ্ছি না।

'বোকার মত কথা বলো না, শুভ্র। অন্ধ হবে কেন?'

'আমার চোখ দ্রুত খারাপ হচ্ছে, ডাক্তার চাচা। এই জন্যেই প্রশ্ন করছি। যদি সত্যি অন্ধ হয়ে যাই — আগের থেকে জানতে চাই। আগে থেকে জানা থাকলে আমার সুবিধা।'

'কি সুবিধা?'

'সেই ভাবে ব্যবস্থা করব।'

মনজুরে এলাহী সাহেব বললেন — তোমার চোখ দ্রুত খারাপ হচ্ছে এটা সত্যি। রেটিনা থেকে যেসব অপটিক নার্ভ ব্রেইনে সিগনাল নিয়ে যাচ্ছে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে প্রসেসটা থামানো হয়েছে। এর আগে তোমার চোখ যতটা খারাপ ছিল এখনো ততটাই আছে। তার চেয়ে খারাপ হয় নি। এটা খুবই আশার কথা। ডিজেনারেশন প্রসেসকে থামানো গেছে।

'থ্যাংক ইউ, চাচা।'

'তুমি সব সময় আনন্দের ভেতর থাকতে চেষ্টা করবে। মনে আনন্দ থাকলে শরীর ভাল থাকে। শরীরের প্রাণবিন্দু হল মন। আমরা ডাক্তাররা বলি মস্তিষ্ক। কিন্তু আমরা নিশ্চিত না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে নিয়ে ফিরছেন। দু'জনে বসেছেন পেছনের সীটে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব এক হাতে শুভ্রের হাত ধরে আছেন। সাধারণত তিনি এমন করেন না। কিছু দূরত্ব ছেলের সঙ্গে তাঁর থাকে। আজ কোন দূরত্ব অনুভব করছেন না।

'শুভ্র!'

'জ্বি।'

'ঐ দিন রিয়ার পার্টি তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল লেগেছে।'

'পার্টি তো তোমার সচরাচর ভাল লাগে না। ঐ পার্টি ভাল লাগল কেন?'

'মূল হৈচৈ-এর সঙ্গে ছিলাম না। আলাদা ছিলাম।'

'নীতুর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'মেয়েটিকে কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'ঐ মেয়েটির কোন দিক তোমার সবচে' ভাল লেগেছে?'

'বুদ্ধি। দারুণ বুদ্ধি।'

'আমার নিজেরো মেয়েটিকে দারুণ পছন্দ। তবে বুদ্ধির জন্যে নয়। আমার কাছে নীতুর বুদ্ধি এমন কিছু বেশি মনে হয় নি। আমার যা ভাল লেগেছে তা হল — মেয়েটি আশেপাশের মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করে। বেশির ভাগ মানুষই যা করে না। অথচ আশেপাশের মানুষকে বোঝার চেষ্টা খুব জরুরি।'

'সবার জন্যেই কি জরুরি?'

'সবার জন্যে জরুরি নয় অবশ্য। কারো কারো জন্যে জরুরি। তোমার জন্যে খুব জরুরি। যে তোমার স্ত্রী হবে তার জন্যে আরো জরুরি। কারণ বিশাল কর্মকাণ্ড তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীকে পরিচালনা করতে হবে। আমার অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছে। আমার শরীর ভাল না। আমি বিশ্রাম নেব। তবে বিশ্রাম নেবার আগে দেখে যেতে চাই — সব গুছিয়ে ফেলেছি।'

শুভ্র বলল, বাবা, তুমি কি চাও যে আমি নীতু মেয়েটিকে বিয়ে করি?

'হ্যাঁ, আমি চাই। তোমার পছন্দের কেউ যদি থাকতো আমি বলতাম না। তোমার পছন্দের কেউ নেই। তোমাকে এ ব্যাপারে অনেক বার জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তুমি প্রতিবারই না বলেছ।'

শুভ্র বলল, আমি ভুল বলেছি, বাবা। আমার পছন্দের একজন আছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব হতভম্ভ হয়ে বললেন, তার নাম জানতে পারি?

'হ্যাঁ পার। নীতু আপা। সাবেরের বোন।'

'শুভ্র, তুমি আমার সঙ্গে কোন হেঁয়ালি করছ না তো।'

'না, হেঁয়ালী করছি না।'

'মেয়েটিকে তুমি আপা ডাক?'

'জ্বি।'

'আমি যতদূর জানি মেয়েটির আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়ে টিকে নি।'

'তুমিই ঠিকই জান, বাবা। তোমার ইনফরমেশন কখনো ভুল হয় না।'

'মেয়েটির আরেকটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে — এও বোধহয় সত্য।'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি তোমার অবেগের কথা মেয়েটিকে বলেছ?'

'না, এখনো বলিনি। তবে বলব।'

'মেয়েটি বয়সে তোমার চেয়ে বড়?'

'জ্বি বাবা, বড়। বছর চারেকের বড়। সেটা কি কোন বড় সমস্যা? চল্লিশ বছরের পুরুষ তো কুড়ি বছরের মেয়ে বিয়ে করছে।'

'শুভ্র, আমি তোমার সঙ্গে কোন তর্কে যেতে চাচ্ছি না। তর্ক করার এটা কোন উপযুক্ত সময় নয়। তা ছাড়া তুমি এখন যে ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে তুমি তর্ক শুনতে প্রস্তুত নও। একটা সময় আসে যখন সব যুক্তি অর্থহীন মনে হয়।'

'আমি তোমার যুক্তি খুব মন দিয়ে শুনি বাবা। এখনো শুনব।'

'এখন আমার নিজের মনও বিক্ষিপ্ত। অফিসে যাব। মনিরুল ইসলাম নামের আমার একজন কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। মনিরুল ইসলামকে নাকি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক, আমি অফিসে নেমে যাব। তুমি গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে যাও। বাই দ্যা ওয়ে, তোমার মা'র সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন কথা বোধহয় এই মুহূর্তে না বলাই ভাল। তার শরীর ভাল না। সামান্য উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতাও তার নেই।'

'আমি কি নীতু আপার সঙ্গে কথা বলতে পারি? দেখা করতে পারি তাঁর সঙ্গে?'

'এখন নয়।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব অফিসে নেমে গেলেন। ঠিক বারোটায় মনিরুল ইসলামের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। সহজ গলায় বললেন, আপনার সমস্যা বলুন। কেঁদে কেঁদে বললে আমি কিছুই বুঝব না। শান্ত হোন। শান্ত হয়ে বলুন।

ভদ্রমহিলার বক্তব্য ইয়াজউদ্দিন সাহেব পুরোটা শুনলেন। গভীর মনযোগের সঙ্গে শুনলেন। তারপর বললেন, আপনার জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগছে। আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন দেখতে পাচ্ছি। অস্থির হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে কেউ অস্থির হবে। বড় বড় কারখানায় অনেক ধরনের রাজনীতি চলে। ইউনিয়ন ক্ষমতার ভাগ–বাটোয়ারা নিয়ে জটিলতা থাকে। সেটা ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে চলে যায়। আমি পুলিশকে বলে দিচ্ছি যেন তারা একটা খোঁজ বের করার চেষ্টা করে। আপনি এখানকার ইউনিয়ন কর্মকর্তা যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন। এরা অনেক কিছু জানে। জেনেও চুপ করে থাকে। মনে হচ্ছে অপনার কিছু আর্থিক সহায়তাও দরকার। আমি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি। সে আপনাকে কিছু টাকা দেবে। মনিরুল ইসলামের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কারখানার সমস্যা সামলানো হয়েছে। খুব চমৎকারভাবেই সামলানো হয়েছে। আগামী দু'বছর আর কোন সমস্যা হবে না।

১০

শুভ্র শুয়েছিল। মাঝে মাঝে কিছুই ভাল লাগে না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আজ মনে হয় সে রকম একটা দিন। আকাশে মেঘলা। বিছানা থেকে আকাশের মেঘ দেখা যায়। এই মেঘ সে আর কতদিন দেখতে পারবে? শুভ্র ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। রেহানা ঘরে ঢুকে বললেন, একটা মেয়ে তোকে টেলিফোন করেছে। বলেছে নীতু আপা। টেলিফোন ধরবি?

'হ্যাঁ।'

'শুয়ে আছিস যখন শুয়ে থাক। আমি পরে টেলিফোন করতে বলি।'

'না, আমি যাচ্ছি।'

'মেয়েটা কে?'

'তুমি চিনবে না, মা। আমার বন্ধু ছিল সাবের — ওর বড় বোন।'

রেহানা বললেন, শুভ্র, আমার শোবার ঘরের টেলিফোন নাম্বার তুই সবাইকে দিয়ে বেড়াবি না। অপরিচিত কারোর টেলিফোন ধরতে আমার ভাল লাগে না। কাউকে যদি টেলিফোন দিতেই হয় — একতলারটা দিবি।

'আচ্ছা।'

'আমার কথায় আবার রাগ করলি না তো শুভ্র?'

'না, রাগ করি নি। তোমার উপর তো আমি কখনো রাগ করি না, মা।'

রেহানা বললেন, অন্যায় কিছু বললেও রাগ করবি না?

'না।'

'কেন?'

'আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই, মা। আমি রাগ করলে তুমি যাবে কোথায়?'

রেহানার চোখে পানি এসে গেল। তিনি চট করে অন্যদিকে তাকালেন। ছেলেকে তিনি তাঁর চোখের পানি দেখাতে চান না। শুভ্র টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো, নীতু আপা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল আছি।'

'তোমাকে কখনো টেলিফোন করে পাওয়া যায় না। যখনই টেলিফোন করি, আমাকে বলা হয়, তুমি বাসায় নেই। কিংবা তুমি ঘুমুচ্ছ। বাসায় যখন থাক তখন কি সারাক্ষণ তুমি ঘুমিয়েই থাক?'

শুভ্র হাসল।

নীতু বলল, শুভ্র, তোমাকে আমার খুব দরকার। না ঠিক আমার না, আমার বাবার দরকার।

'উনার কি শরীর ভাল নেই?'

'উনার কিছুই ভাল নেই। উনি গত দু'দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছেন।'

'কেন?'

'উনি ঠিক করেছেন — অনাহারে থেকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন। এক চৈনিক কবিও না-কি তাই করেছেন। কবির নাম হল — লিয়াও সিন কিংবা লিয়াও ঝিন। তুমি কি আসতে পারবে?'

'পারব।'

'বাবা তোমাকে কিছু বলতে চান। তুমি দয়া করে শোন উনি কি বলতে চাচ্ছেন।'

'আপা, আমি আপনাকে একটা খুব জরুরি কথা বলতে চাই।'

'আমাকে আবার কি জরুরি কথা?'

'আপনি চুপ করে শুনুন। দয়া করে রাগ করবেন না।'

'এমন কি কথা যে রাগ করার প্রশ্ন আসে?'

'আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি।'

'এটা তো রাগ করার মত কথা না, শুভ্র। খুশি হবার মত কথা। আমি তোমাকে পছন্দ করি। বাবা তোমাকে যতটা পছন্দ করেন ততটা হয়ত না। কিন্তু কমও না।'

'আমি যে আপনাদের বাসায় প্রায়ই যাই — চাচার সঙ্গে দেখা করতেই যাই। কিন্তু যখন দেখি আপনি বাসায় নেই তখন ভয়ংকর খারাপ লাগে।'

'ও আচ্ছা।'

'প্রায়ই আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখি। কাল রাতেও দেখেছি।'

'শুভ্র, তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি না। তোমার শরীর ভাল তো!'

'হ্যাঁ, শরীর ভাল। নীতু আপা, এখন আমি আপনাকে একটা ভয়াবহ কথা বলব।'

'ভয়াবহ কথা তুমি বলে ফেলেছ বলে আমার ধারণা।'

'না, বলিনি। এখন বলব। নীতু আপা, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই।'

নীতু চুপ করে রইল। মনে হচ্ছে হঠাৎ টেলিফোন ডেড হয়ে গেছে। শুভ্র বলল, আপনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি রাগ করেছেন?'

'টেলিফোনে না। মুখোমুখি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'আমি কি এখন আসব?'

'না এখন না। কাল এসো। আমার কোন ভাল শাড়ি নেই। শুভ্র, আমি সুন্দর একটা শাড়ি কিনব। আজই কিনব। কি রঙ তোমার পছন্দ বলতো?'

'নীতু আপা, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'বুঝতে পারছি না। তুমি আমার মাথা এলোমেলো করে দিয়েছ। তুমি কাল এসো। কাল আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। রাখি শুভ্র।'

১১

জাহেদ মহাবিপদে পড়েছে। মিজান সাহেব দেশের বাড়িতে পৌঁছে ঘোষণা দিয়েছেন — এখানেই থাকবেন — আর শহরে ফিরবেন না। গ্রামে থাকার ব্যবস্থা নেই বললেই হয়। টিনের ঘর দু'টির ভগ্নদশা। ভিটের ভেতর মানুষ সমান ঘাস গজিয়েছে। বাড়ির দরজা জানালা লোকজনে খুলে নিয়েছে। খাট-চৌকি কিছুই নেই। মেঝেতে বিছানা করে ঘুমুতে হবে। মেঝেময় গর্ত। সাপের না ইঁদুরের, কে বলবে?

জাহেদ বলল, এর মধ্যে কি থাকবে? চল কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠি। খাওয়া-দাওয়াতো করতে হবে। খাব কি? এখানেতো আর হোটেল নেই।

মিজান সাহেব বললেন, নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়িতে থাকব, তোর কি ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে, নিজের ভাঙ্গা বাড়িই হচ্ছে অট্টালিকা। এইখানেই থাকব।

'আর খাওয়া-দাওয়া?'

'হাড়িকুড়ি কিছু আন। ইট পেতে আগুন করে রান্না হবে। পিকনিক হবে, বুঝলি? রোজ পিকনিক। নিজের বাড়ি থাকতে অন্যের বাড়ি আমি খাব না। শেষে বিষ-টিষ মিশিয়ে দেবে।'

'বিষ মিশাবে কেন?'

'আরে গাধা, চারদিকে শত্রু। জমিজমা সব বেদখল হল কি জন্যে? কারা এইসব নিল? তবে এসেছি যখন সব শায়েস্তা করে যাব। দরকার হলে মার্ডার করব। মামা ভাগ্নে যেখানে বিপদ নেই সেইখানে। কিরে, পারবি না আমাকে সাহায্য করতে?'

জাহেদ চোখে অন্ধকার দেখছে। একি সমস্যা।

রাতে থাকার জন্যে চৌকি জোগাড় করা হয়েছে। চৌকির উপর তোষক বিছিয়ে বিছানা। খাবার ব্যবস্থা জাহেদের দূর সম্পর্কের এক খালার বাসায়। মিজান সাহেব কিছুতেই সেখানে খেতে যাবেন না। জাহেদ একা গিয়ে খেয়ে এল। বাটিতে করে খাবার নিয়ে এল। মিজান সাহেব সেই খাবারও মুখে দিলন না। চোখ কপালে তুলে বললেন, অসম্ভব। তুই কি আমাকে মারতে চাস? স্বপাক আহার করব। নিজে রেঁধে খাব।

তৃতীয় দিনের দিন সে প্রায় জোর করেই মামাকে নিয়ে ঢাকায় এসে নামল। ট্রেন

থেকে তিনি নামলেন বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায়। রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে করুণ গলায় বললেন, এরা আমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন ভাই সাহেব। গ্রামের বাড়িতে সুখে ছিলাম, ভুলিয়ে ভালিয়ে এনেছে। গরু জবেহ্ করার বড় ছুরি আছে না? ঐটা দিয়ে জবেহ করবে। ঘুমের মধ্যে কাম সারবে। আল্লাহ হু আকবর বলে গলায় পোচ।

তিনি বাসায় ঢুকলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। মনোয়ারাকে দেখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কি রে মাগী — স্বামীকে খুন করাতে চাস? বেশ, খুন কর। কিচ্ছু বলব না। চিৎকারও দিব না। তবে খিয়াল রাখিস, আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে। খুনের সময় আমাকে কিন্তু উত্তর দক্ষিণে শোয়াবি। ভালমত গোসল দিবি। নাপাক অবস্থায় আল্লাহর কাছে যেতে চাই না।

মনোয়ারা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেলেন। মিজান সাহেবের মেয়ে দু'টি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন — খুকীরা, ভয়ের কিছু নেই। নির্ভয়ে থাক।

জাহেদ পাড়ার ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনল। তিনি ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। জাহেদকে বললেন, রুগীর অবস্থা ভাল দেখছি না। যে কোন সময় ভায়োলেন্ট পর্যায়ে চলে যেতে পারে। আপনি বরং কোন একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেন। বাচ্চা কাচ্চার সংসার। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? ইনজেকশনের এফেক্ট বিকেল পর্যন্ত থাকবে। এরমধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন। বনানীতে একটা ক্লিনিক আছে — নাম হল মেণ্টাল হোম। ইলেকট্রিক শক দেবার ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা আছে আমার কাছে — চার্জ বেশি। কিন্তু টাকার দিকে তাকালেতো এখন হবে না। দেব ঠিকানা?

জাহেদ বলল, দিন।

'আপনাদের বংশে পাগলের হিস্ট্রি আছে?'

'জ্বি না।'

'আজকাল অবশ্যি হিস্ট্রি ফিস্ট্রি লাগে না। এম্নিতেই লোকজন পাগল হয়ে যাচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখবেন ডিসপেনসারিগুলিতে নার্ভ ঠাণ্ডা রাখার অষুধ সবচে বেশি বিক্রি হয়। ঘুমের অষুধ ছাড়া কেউ ঘুমুতে পারে না।'

সন্ধ্যাবেলা জাহেদ তার মামাকে মেণ্টাল হোমে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এল। তিন হাজার টাকা অগ্রীম জমা দিতে হল। দৈনিক তিনশ টাকা হিসেবে দশ দিনের ভাড়া। এই তিনশ টাকার মধ্যে খাওয়া খরচ ধরা নেই। মনোয়ারা তাঁর গয়না বিক্রি করলেন। বেবীটেক্সী ভাড়া করে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি ঘুরতে লাগলেন ধারের জন্যে।

বিপদ একদিকে আসে না। নানানদিকে একসঙ্গে এসে সাঁড়াশি আক্রমণ করে। মিজান সাহেবের বাড়িওয়ালা জাহেদকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। চা খাওয়ালেন, পাপড় ভাজা খাওয়ালেন। অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, আপনার মামার খবর শুনলাম। খুবই দুঃখ পেয়েছি। দুঃখ পাবারই কথা। অতি ভদ্রলোক ছিলেন। মাসের তিন তারিখে মাসের ভাড়া পেয়েছি। কোন দিন দেরী হয় নাই। শেষ কয়েকমাসে কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যা হতেই পারে। দিনতো সমান যায় না। সাগরে যেমন জোয়ার ভাটা আছে — মনের জীবনেও জোয়ার ভাটা আছে। সবই বুঝি। কিন্তু জাহেদ সাহেব, আমার ব্যবস্থাটা কি?

জাহেদ বলল, একটু সময় দিন। মামার অফিসে লোনের জন্য দরখাস্ত করছি— লোনটা পেলে প্রথমেই আপনার টাকাটা দিয়ে দেব।

'আমাকে টাকা দিলেতো আপনার চলবে না। আপনাদের খরচপাতিও আছে না। পাগলের চিকিৎসা খুবই খরচের চিকিৎসা। আগে যক্ষা ছিল রাজরোগ এখন রাজরোগ হল 'পাগলামী।' আমাকে কোন টাকা পয়সা দিতে হবে না।'

'বলেন কি?'

'সত্যি কথা বললাম ভাই। আমিও ভদ্রলোকের ছেলে। মানুষের বিপদ-আপদ বুঝি। আমাকে কোন টাকা পয়সা দিতে হবে না। তবে এই মাসের ২৮ তারিখের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আমি অন্য জায়গায় ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। ৩০ তারিখে ভাড়াটে চলে আসবে।'

'কি সর্বনাশের কথা।'

'কোন সর্বনাশের কথা না ভাই। বাস্তব কথা। বাস্তব অস্বীকার করতে নাই। বাস্তব স্বীকার করে নিতে হয়। এখনো তিন চার দিন সময় আছে। একটা বাসা ঠিক করে উঠে চলে যান। আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমার ট্রাক আছে। ট্রাক দিয়ে মালপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করব। একটা পয়সা লাগবে না। শুধু পেট্রোলের খরচ হিসাবে কিছু ধরে দেবেন।'

জাহেদ বলল, আপনিতো ডেনজারাস লোক।

'উপকার করতে গেলে ডেনজারাস লোক হতে হয়। এইজন্যে উপকার করতে নাই। ছ'মাসের ভাড়া মাফ করে দিলাম এটা চোখে পড়ল না? নেন ভাই ধরেন। সিগারেট খান। না-কি ধূমপান করেন না?'

জাহেদ সিগারেট নিল না। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। সামান্য সিগারেটের ধুয়াতো সেই ভাঙ্গা আকাশের কিছু হবে না।

'ভাইসাহেব এই হল আমার বক্তব্য। চা আরেক কাপ দিতে বলব?'

'বলুন।'

'শুনেছি আপনিও বিবাহ করেছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

জাহেদ কেয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কেয়ার দুলাভাই ঘরে ছিলেন। তিনি কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, কি খবর?

জাহেদ বলল, ভাল।

'বোস।'

জাহেদ বসল। ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, তোমার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। স্ত্রীকে এখানেই ফেলে রাখবে?

'জ্বি না — একটু সমস্যা যাচ্ছে। সাময়িক সমস্যা। বাড়ি ভাড়া করেছি। সামনের সপ্তাহে নিয়ে যাব।'

'কোথায় বাড়ি ভাড়া করেছ?'

'ইয়ে সোবাহান বাগ। ফ্ল্যাট বাড়ি। দুই রুম। দুই বাথরুম।'

'ভাড়া কত?'

'ইয়ে ভাড়া এখানো সেটল হয় নাই — দুই হাজার চাচ্ছে —মনে হয় কিছু কমবে। ফার্নিচার টার্নিচার এখনো কেনা হয়নি। এইসব কেনা কাটা করছি। কেয়া কি আছে? গুলশান মার্কেট থেকে কিছু ফার্নিচার কিনব। ভাবছি ওকে সঙ্গে নিয়েই কিনি।'

'ও যেতে পারবে না। জ্বর।'

'জ্বর না-কি?'

'গোসল করে সারারাত ঠাণ্ডা বাতাসে বসে বুকে ঠাণ্ডা বাঁধিয়েছে। কারো কথা তো শুনে না।'

কেয়ার অনেক জ্বর। তবু সে বলল, সে যাবে। কেয়ার বড় বোন বললেন, তুই কি অসুখ আরো বাড়াতে চাস? ডাক্তার বলে গেল নিউমোনিয়ার লক্ষণ।

কেয়া বলল, ঘরে বসে আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। একটু ঘুরে আসি।

'তুই ইচ্ছা করে অসুখ বাড়াচ্ছিস।'

'আমি চলে আসব আপা।'

কেয়া বলল, হুড ফেলে দাও।

জাহেদ বলল, এই অবস্থায় হুড ফেলে দেব কি? তোমারতো সিরিয়াস ঠাণ্ডা

লাগবে।

'লাগুক।'

'তুমি আমার হাত ধরে বসে থাক। আজ অনেকক্ষণ ঘুরব। তুমি ভাল আছ তো?'

'আছি।'

'নীল সার্টটা কিনেছ?'

'না, এখনো কিনিনি।'

'এখনো কেননি। কবে কিনবে?'

'খুব শিগগীরই কিনব।'

'দুলাভাইকে যে দু'রুমের ফ্ল্যাটের কথা বলছিলে — বানিয়ে বানিয়ে বলছিলে, তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি বুঝতে পেরে মনে মনে হাসছিলাম। বানিয়েই যখন বলছ দু'রুমের ফ্ল্যাট বললে কেন? বললে না কেন চার রুমের দখিণ দূয়ারী ফ্ল্যাট। একটা সার্ভেন্টস রুম।'

'চল, ফিরে যাই কেয়া।'

'না, এখন ফিরব না। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরব। তোমার মামার অবস্থা কি?'

'অবস্থা ভাল না।'

'ভাল না হলে বলার দরকার নেই। খারাপ তো কিছু শুনতে ইচ্ছা করছে না। তুমি কি রাতে খেয়েছ?'

'না।'

'তাহলে চলতো — কোন একটা ভাল রেস্টুরেণ্টে চল। তুমি খাবে আমি দেখব। আমার সঙ্গে টাকা আছে।'

'তুমি সুস্থ হয়ে নাও তারপর একসঙ্গে দু'জন খাবো।'

'না, আজই তুমি খাবে। আমি দেখব। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন তুমি আরাম করে কিছু খাও না। তোমার স্বাস্থ্য যে কি খারাপ হয়েছে তা তুমি জান? আচ্ছা এক কাজ কর, হুড তুলে দাও। আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। জ্বর — বেড়েছে বোধহয়। দেখ তো। আচ্ছা এত সংকোচ করে গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? আমি তোমার স্ত্রী।'

১২

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের শরীর খারাপ লাগছে। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। বলেছেন প্রেসার হাই। সিডেটিভ খেতে দিয়েছেন। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে বলেছেন। তিনি ঘর অন্ধকার করেই শুয়ে আছেন। রেহানা তেতুলের সরবত নিয়ে এসেছেন। তিনি বাধ্য শিশুর মত সরবত খেলেন। গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, শুভ্র কি ঘরে আছে?

'হ্যাঁ আছে।'

'কি করছে?'

'জানি না–তো। দেখে আসব?'

'দেখে আসতে হবে না। তুমি রিয়াকে টেলিফোনে আসতে বল। বলবে খুব জরুরী।'

'কি হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। ভাল কথা, শুভ্র কি আজ দিনে কোথাও বের হয়েছিল?'

'না।'

'তুমি শুভ্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, আমি যতক্ষণ কথা বলব তুমি ঘরে ঢুকবে না।'

'কি ব্যাপার?'

'কোন ব্যাপার না।'

'ডাক্তার তোমাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'আমি চুপচাপ শুয়েই আছি।'

রেহানা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে বের হলেন। শুভ্র তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, আমার পায়ের কাছের চেয়ারটায় বস শুভ্র, আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলব। পায়ের কাছে বসলে আমি তোমার মুখ দেখতে পারব।

শুভ্র বলল, অন্ধকারে মুখ দেখবে কি করে?

'টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দাও।'

শুভ্র বাতি জ্বালাল। ইয়াজউদ্দিন খাটে আধশোয়া হয়ে বসে আছেন। তার খালি গা। তাঁর সারা গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম। খাটের মাথায় রাখা তোয়ালে দিয়ে তিনি শরীরের ঘাম মুছলেন।

'শুভ্র!'

'জ্বি বাবা।'

'আমি তোমাকে কি পরিমান ভালবাসি তাকি তুমি জান?'

'জানি।'

'না, তুমি জান না।'

শুভ্র হেসে ফেলল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব কঠিণ গলায় বললেন, হাসলে কেন?

'তোমার ছেলেমানুষীতে হাসছি বাবা। ছেলেকে ভালবাসায় তুমি আলাদা কিছু না। অন্য সব বাবাদের মতই। পৃথিবীর সব বাবাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের প্রচন্ড ভালবাসেন। তুমি এমন কোন বাবার কথা বলতে পারবে যে তাঁর ছেলেকে ভালবাসে না।'

'শুভ্র তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছ?'

'তর্ক করতে চাচ্ছি না। তোমার লজিকের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি।'

'ভুল ধরিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি সারাজীবন মনে করে এসেছ তোমার লজিক অভ্রান্ত। তুমি যা ভাবছ তাই সত্যি।'

'এ রকম মনে করার যথেষ্ট কারণ কি নেই?'

'কারণ আছে। তোমার মত ভাল লজিক দিতে আমি এ পর্যন্ত শুধু একজনকেই দেখেছি।'

'কে? তোমার নীতু আপা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি তাকে বলেছ যে তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?'

'বলেছি।'

'সে কি বলেছে?'

'আগামী কাল আমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'তুমি তাহলে আগামী কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'আমি যদি বলি যেও না। তারপরেও যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব। তুমি কি আমাকে যেতে নিষেধ করছ?'

'না নিষেধ করছি না। তুমি অবশ্যই যাবে।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব দম নেবার জন্যে থামলেন। তোয়ালে দিয়ে আবার গায়ের ঘাম মুছলেন। তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। হাতের কাছে রাখা পানির গ্লাসটা শূন্য। শুভ্র বলল, পানি এনে দেব বাবা?

'দাও।'

শুভ্র পানি এনে দিল। তিনি এক নিঃশ্বাসে সবটুক পানি খেলেন। শুভ্রর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। শুভ্রও হাসল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, আমরা এমন ভাবে কথা বলছি যেন দু'জন দু'জনের প্রতিপক্ষ। তা কিন্তু না শুভ্র। আমরা আলোচনা করতে বসেছি। গল্প করতে করতে হাসি মুখে আলোচনা করা যায়।

'আমি তোমাকে কখনোই প্রতিপক্ষ ভাবি না বাবা। কখনোই না।'

'না ভাবাই ভাল। আমি খুব শক্ত প্রতিদ্বন্দি। তুমি যুদ্ধে আমার সঙ্গে পারবে না। হেরে যাবে।'

না বাবা, তা হবে না। আমি হারব না। তুমিও আমাকে হারাতে পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি তোমারই ছেলে। তোমার যেমন হেরে অভ্যাস নেই — আমারো নেই।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বালিশের নীচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট তাঁর জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ কিন্তু এখন তিনি সিগারেটের জন্যে প্রবল তৃষ্ণা বোধ করছেন।

'শুভ্র আমি যে অসুস্থ তাকি তুমি জান?'

'জানি বাবা।'

'পুরোপুরি বোধহয় জান না। আমি গুরুতর অসুস্থ। কাউকে তা বুঝতে দেই না। নিজের সমস্যা আমি নিজের মধ্যে রাখতে ভালবাসি।'

'আমিও তাই করি। আমিও নিজের কষ্ট নিজের ভেতর রাখার চেষ্টা করি। মা যখন আমাকে জাহেদের বিয়েতে যেতে দিল না — আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। আমি তো মা'কে কিছুই বলিনি। আমি আমার এই দরিদ্র বন্ধুকে সামান্য একটা উপহার দিতে চেয়েছিলাম। তুমি তা দিতে দাও নি। আমিতো কোন অভিযোগ করি নি।'

'এখন করছ?'

'হ্যাঁ, এখন করছি। তুমিও করছ বাবা। কাজেই সমান সমান।'

'হ্যাঁ, সমান সমান।'

'বাবা, তুমি কি লক্ষ্য করছ আমি লজিকে তোমাকে হারিয়ে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, লক্ষ্য করছি।'

'তুমি কি রেগে যাচ্ছ ?'

'না, রেগে যাচ্ছি না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, টি ব্রেক নিলে কেমন হয় শুভ্র।'

শুভ্র বলল, ভালই হয়।

আমার চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে। তোর মা'কে চা দিতে বলি।

'বল এবং মাকে এখানে আসতে বল বাবা। মা কেন আলোচনার বাইরে থাকবে?'

'তার বাইরে থাকাই ভাল। আমি এখন কিছু কিছু কঠিন কঠিণ কথা বলব। তোকে কঠিণ কথা বললে তোর মা সহ্য করতে পারে না। সে হৈ চৈ করতে থাকবে। আমি হৈ চৈ সহ্য করতে পারি না।'

'তোমার কঠিণ কথাগুলি বল বাবা, শুনি।'

'কঠিন কথা হল, আমি আজ থেকে অবসর নিয়েছি। সমস্ত কর্মকান্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমার যা আছে সব কিছু দেখার এবং সব কিছু চালিয়ে নেবার দায়িত্ব এখন তোমার। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। একদল দক্ষ সেনাপতি তৈরী করা আছে। তারা তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি ভুল করবে। ভুল করতে করতে শিখবে।'

'তুমি কি করবে?'

'আপতত চিকিৎসার জন্যে বাইরে যাব। তোমার মা'কে নিয়ে যাব।। কিছুদিন ঘুরব বাইরে বাইরে। কতদিন তা জানিনা।'

রেহানা চা নিয়ে ঢুকলেন। ভীত গলায় বললেন, রিয়াকে টেলিফোন পাওয়া যায় নি। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, ওকে লাগবে না। রেহানা আজ যে একটা বিশেষ দিন তা-কি তুমি জান? রেহানা চুপ করে রইলেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, তুমি জান না। আমিও তাই ভেবেছিলাম। আজ আমার জন্মদিন।

শুভ্র বলল, শুভ জন্মদিন বাবা।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, থ্যাংক ইউ শুভ্র। থ্যাংক ইউ।

তিনি রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, একজন ডাক্তারকে খবর দাও। আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে। শুভ্র !

'জ্বি।'

'বাতি নিভিয়ে চলে যাও। ভাল কথা, তোমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীকে তুমি

তোমার জয়দেবপুরের বাড়িতে কিছু দিন রাখতে চেয়েছিল — ওদের নিয়ে যাও। এ ব্যাপারে আমি আগে যা বলেছিলাম — তা ঠিক বলিনি। আমি ভুল করেছি।

'থ্যাংক ইউ বাবা।'

'তুমি এদের এখন সাহায্যও করতে পার — তোমার একটি টেলিফোনে তোমার বন্ধুর খুব ভাল চাকরি হবার কথা। দু' একটা জায়গায় টেলিফোন করে দেখতে পার।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছে।

১৩

নীতুদের বাসার সামনে শুভ্র অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কলিংবেলে হাত দেবার সাহস পাচ্ছে না। কলিংবেলটাও ভাল না। হাত দিলেই শক লাগে।

শুভ্র বেলে হাত রাখল। আশ্চর্য আজ শক করল না।

দরজা খুলে দিল নীতু। সহজ গলায় বলল, এসো শুভ্র। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। অফিসেও যাই নি। বেছে বেছে তোমার জন্যে এই লাল শাড়িটা পড়লাম। যদিও লাল রঙ আমার পছন্দ নয়। দেখতো ভাল লাগছে কি না।

নীতু অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল।

শুভ্র বলল, চাচা কোথায়?'

'বাবা নেই। নেই বলায় মনে করো না তিনি মারা গেছেন। তিনি ভালই আছেন। তাঁকে আজ ভোরে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছি। ডাক্তাররা এখন তাঁকে নল দিয়ে খাওয়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন শুভ্র বস।'

শুভ্র বসল। নীতু বলল, চা খাবে চা দেব? সেজে গুজে আছি এই অবস্থায় রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছা করে না। তবু তুমি চাইলে যেতে হবে। বলাতো যায় না যদি সত্যি সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে কর তাহলে তোমার কথাতো শুনতেই হবে। বয়সে ছোট হলেও তুমি তখন হবে আমার স্বামী। তাই না?

নীতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল।

শুভ্র বলল, আপনি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছেন কেন? আমি আমার মনের ইচ্ছার কথাটা আপনাকে বলেছি। আপনাকে অপমান করবার জন্যে বলি নি। আপা আপনি বসুন। আপনি ছটফট করছেন।

নীতু বসল। শুভ্রের সামনেই বসল। নীতু আজ সত্যি সত্যি সেজেছে। তার গায়ে লাল সিল্কের শাড়ি — ঠোঁটে কড়া করে লাল লিপস্টিক দেয়া। শুভ্র কখনো নীতুর ঠোঁটে লিপস্টিক দেখেনি।

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'তোমার প্রস্তাব শোনার পর আমার কি অবস্থা হল তোমাকে আগে বলি। প্রথম খুব হাসলাম। শব্দ করে হাসলাম। আমার পাশে যে টাইপিষ্ট বসে — আরতী ধর। সে বলল, দিদি এত হাসছেন কেন? আমি তাকে বললাম, দারুণ একটা কাণ্ড হয়েছে। আমি একটা বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছি। শুভ্র তুমি কি মন দিয়ে আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'আরতি বলল, বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তাহলেতো ভাল কথা। এতে হাসির কি হল — ছেলে কেমন। কি করে? আমি বললাম, ছেলে রাজপুত্রের মতো। এবং এই ছেলে জীবনে কোন পরীক্ষায় কখনো সেকেণ্ড হয়নি। তার টাকা পয়সা যে কত আছে তা সে নিজেও জানে না।'

শুভ্র আমার কথা শুনছ?

'শুনছি।'

'আমাকে বিয়ের ইচ্ছা এখনো তোমার মনে আছেতো না-কি মত বদলেছ?'

'মত বদলাই নি।'

'গুড। এখন বল কেন বিয়ে করতে চাও? আমার রূপের জন্যে? আমি কি খুব রূপবতী?'

'আপনি রূপবতী। তবে রূপ তেমন বড় কিছু নয়।'

'ঠিক বলেছে। রূপ বড় কিছু নয়। অতি বিত্তবানদের কাছে রূপ বড় কিছু না কারণ রূপ তারা চারদিকে দেখছে। রূপ তাদের কাছে সহজ লভ্য। রূপ নিম্নবিত্তদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক বলছি না?'

'হ্যাঁ ঠিক বলছেন।'

'তাহলে বল কেন আমাকে তোমার এত পছন্দ হল? তোমার মুখ থেকে শুনি।'

'আপা আমি জানি না। বিশ্বাস করুন জানি না।'

'আমার মনে হয় আমি জানি। আমার শরীরটাই তোমাকে মুগ্ধ করেছে। লজ্জা পেও না শুভ্র তাকাও আমার দিকে। ভেরী গুড! এইত তাকাচ্ছ। ভীতু টাইপের স্বামী আমার পছন্দ না।'

শুভ্র বলল, আপা আমি এক গ্লাস পানি খাব।

'পানি এনে দিচ্ছি। কিন্তু খবর্দার আপা ডাকবে না। যাকে বিয়ে করতে চাও তাকে আপা ডাকতে অস্বস্তি লাগছে না?'

নীতু পানি এনে দিল। শুভ্র পানি শেষ করল। নীতু বলল, আমার কথা বোধহয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কেন জান? কাল রাতে ঘুম হয়নি। সারারাত ছটফট

করেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি হয়েছে? একবার ভাবলাম বলি, শুভ্র আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে এই উত্তেজনায় আমার ঘুম হচ্ছে না। শেষে বললাম না। বাবাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না। আমি কি করলাম জান শুভ্র? সারারাত বারান্দায় হাঁটাহাটি করলাম। দু'বার মাথায় পানি ঢাললাম। তারপর ঠিক করলাম, তুমি যখন আসবে তখন তোমাকে বলব আমার শরীরটাই তো তোমার দরকার। বেশতো শরীরটা কিছুক্ষণের জন্যে তোমাকে দেব। তার বদলে মোটা অংকের কিছু টাকা তুমি আমাকে দাও। টাকাটা পেলে আমার লাভ হবে। বাবাকে দিয়ে দিতে পারব। তিনি শান্ত হবেন। ঘর ভাড়া করে একা একা থাকবেন। তাঁর সেবার জন্যে কিছু লোকজন থাকবে। আমার বুদ্ধিটা ভাল না শুভ্র?

শুভ্র এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নীতু বলল, কথা বলছ না কেন? তুমি চাইলে আমি সব কাপড় খুলে ফেলতে পারি। ঘরেও কেউ নেই। তবু তোমার কাছে যদি মনে হয় ঘরে বেশি আলো তাহলে জানালা বন্ধ করে দিতে পারি।

শুভ্র কিছু বলার আগেই নীতু উঠে জানালা বন্ধ করে দিল। ঘর আবছা অন্ধকার হল। নীতু বলল, অন্যদিকে তাকাও শুভ্র। নগ্ন হয়ে প্রেমিকের সামনে আসা কঠিন নয়। কিন্তু প্রেমিকের সামনে নগ্ন হওয়া বেশ কঠিন।

শুভ্র বলল, আপা কেন আপনি আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আমি আপনাকে আর বিরক্ত করব না। চলে যাব। আমি কিন্তু আপা কখনোই আপনাকে অপমান করতে চাই নি। তবু আপনি আমার কথায় অপমানিত হয়েছেন। I am so sorry.

নীতু লক্ষ্য করল শুভ্র কাঁদছে। ছোট শিশুদের মতই কাঁদছে। নীতু কোমল গলায় বলল, তুমি সাবেরের বন্ধু । তোমাকে আমি তার মতই দেখি। এবং পাগলের মত পছন্দ করি। কেঁদো না শুভ্র — তুমি কাছে আস আমি তোমাকে আদর করে দি। সাবের যখন খুব মন খারপ করতো সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতো। আমি তাকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করতাম।

শুভ্র উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, নীতু আপা আমি যাই। আপনি চাচাকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার এখন অনেক ক্ষমতা নীতু আপা। আমি এখন অনেক কিছু করতে পারি।

নীতু কোমল গলায় বলল, আমি জানি। তোমার বাবা আমার কাছে এসেছিলেন। সব দায়িত্ব তোমার কাছে দিয়ে তিনি বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন সেই কথা আমাকে বলেছেন।

'আর কি বলেছেন?'

নীতু হাসতে হাসতে বলল, আরেকটা অন্যায় অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন

আমি যেন তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হই। প্রত্যাখ্যানের অপমান থেকে তিনি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয় না শুভ্র। তুমি কি বুঝতে পারছ যে তা হয় না?'

'পারছি।'

'তোমার বাবাকে আমার রির্গাডস দিও। চমৎকার মানুষ। আমার উনাকে পছন্দ হয়েছে। বুঝলে শুভ্র উনি যুক্তি দিয়ে আমাকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছিলেন যে তোমাকেই আমার বিয়ে করা উচিত।'

'বাবা খুব ভাল যুক্তি দিতে পারেন।'

'আমার উনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কাউকেই পা ছুঁয়ে সালাম করি না। আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁকে পা ছুয়ে সালাম করেছি।'

১৪

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের মেসিভ হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। রেহানা স্বামীর হাত ধরে বসে আছেন। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। এ্যাম্বুলেন্স খবর দেয়া হয়েছে — এখনো আসছে না। শুভ্র বাড়িতে নেই। রেহানা অস্থির হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে তিনি অচেতন হয়ে পড়বেন। ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর অস্থিরতা দেখে হাসলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, শুভ্রর সঙ্গে দেখা হবে কি–না আমি বুঝতে পারছি না। যদি দেখা না হয়, যদি এই যাত্রাই আমার শেষ যাত্রা হয়, তাহলে তুমি শুভ্রকে বলবে অন্যদশজন বাবা তার ছেলেকে যতটা ভালবাসে আমি তাকে তারচে অনেক বেশি ভালবাসি। তার মত একটি ছেলের জন্ম আমি দিতে পেরেছি এই আনন্দই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি বিপুল অর্থ ও বিত্ত শুভ্রর জন্যে রেখে গেলাম — আমার দেখার খুব শখ শুভ্র এই অর্থ বিত্ত দিয়ে কি করে। আমার এই শখ বোধ হয় মিটবে না। মনে হচ্ছে এ আমার শেষ যাত্রা।

মৃত্যুর আগে কিছুক্ষণের জন্যে ইয়াজউদ্দিন সাহেবের জ্ঞান ফিরল, তিনি এদিক ওদিক তাকালেন — হয়ত শুভ্রকে খুঁজলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা শুভ্রকে একটু ছুঁয়ে দেখেন। তিনি ফিস ফিস করে ডাকলেন শুভ্র ! শুভ্র !

তাঁর চারপাশে একদল মুখোশ পরা ডাক্তার। কয়েকজন নার্স। সেই প্রিয় মুখ নেই।